ভূতপুরাণ

প্রিয়বর শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বঙ্গ সাহিত্যের খ্যাতনামা য-ম দত্ত—

প্রীতিভাজনেষু।

কিছু দিন থেকেই যেন কিসের একটা ইশারাগোছের পাচ্ছি। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে বের হয় না, "রেডিয়ো তরঙ্গের বিশেষ একটি স্পন্দনে যেন কোন এক অজানা দেশের সংকেত পাওয়া যাইতেছে। একটা কেমন শব্দ উঠিতেছে। ইহার অর্থ কি তাহা বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত না হইলেও ইহা গ্রহান্তর হইতে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীদের দ্বারা প্রেরিত তাহাতে তাঁহারা সন্দেহ করেন না।" ইশারাটা ওই ধরনের।

গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করে, বুকটা ঢিবঢিব করে, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে, বুড়ো বয়সে যেমন হয় তেমনি, তবে তার থেকেও অতিরিক্ত বা বেশী কিছু আছে। কানের কাছে ফিস্ করে শব্দ হয়, বুকের পাঁজরায় কে যেন আঙুল ঠেকায়, মাথার চুলগুলো উঠে গিয়ে যে ক'টা অবশিষ্ট আছে তাই ধ'রে কে যেন টান দেয়। মধ্যে মধ্যে কানের ভেতর পালকজাতীয় একটা কিছুর স্পর্শ বুলিয়ে সুড়সুড়ি দেয়।

মধ্যে মধ্যে টুপটাপ শব্দ হয়; মনে হয় কেউ যেন কোন অন্তরাল থেকে ছোট ছোট ঢিলা কুড়িয়ে ছুঁড়ছে।

নানা রকম সন্দেহ হয়। বাড়ির পাশেই একেবারে জানালার সামনে একটা বেল গাছ লাগিয়েছি; লোকজনে মনে করে বেলপাতা এবং পাকাবেলের জন্য লাগিয়েছি ওটা; কিন্তু তা নয়, ওটা লাগিয়েছি মরবার পর যদি ছেলেরা নাতিরা শ্রাদ্ধ ক'রে ঘরের ভেতর থেকে তাড়িয়েই দেয় তবে ওই গাছটার ডালে দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসবার মত ব্যবস্থা ক'রে বাসা বেঁধে নেব। ওই গাছটার দিকে তাকিয়েই থাকি, তাকিয়েই থাকি, দেখি কোন ভূতটুত আমার আগেই এসে জবর দখল নিয়ে বসল কিনা। পাছে তেমনটা হয় তার জন্য মা চণ্ডীর নাম নিয়ে গণ্ডি দিয়ে ঘিরে রাখি, বাবা ভূতভাবন ভোলামহেশ্বর শিবের নাম উচ্চারণ করে হাঁক দিই—বম্, শঙ্কর ভোলামহেশ্বর।

এমত সময় একদিন, সময়টা পূজার আগে; ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাস, ১৩৭৪ সন শ্রাবণ মাস। পূজা সংখ্যার লেখার তাগিদ মাথায় নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছি লিখব কি? এমত সময় একদিন, যম দত্ত মহোদয় এসে হাজির হলেন—বলি, বাড়ি রয়েছ নাকি—?

চমকে উঠলাম—উৎসাহিত হলাম—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললাম—আরে, এস এস—এস! দত্ত এস।

দত্তের পরিচয় কিছু দেওয়ার প্রয়োজন এখানে। দত্ত—যম দত্ত অর্থাৎ যতীন্দ্রমোহন দত্ত একজন এম-এ, বি-এল; সারা জীবন ওকালতি করেছেন, কিন্তু সেটাই তাঁর কোনমতেই সত্যকারের পরিচয় নয়। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, অঙ্ক ক'ষে-ক'ষে দশ মুণ্ড কুড়ি হাত নিয়ে রাবণ শুতো কি ক'রে—চিৎ থেকে পাশ ফিরত কি ক'রে, লম্বায় তার মাপ থেকে দশ মুণ্ড বিশ হাত সমেত চওড়ায় মাপ কত ফুট কত ইঞ্চি বেশী—তা' বের করেছেন, মহিষাসুরের শিং দুটো সোজা ছিল না বাঁকা ছিল এবং মাপে কত ছিল তা' বের করেছেন; তার সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়োর লোকসংখ্যা, ট্রয় যুদ্ধে কতলোক মরেছে তাও বের ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন। ইয়োরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর সংখ্যাতত্ত্বের উপর লিখিত প্রবন্ধ বের হয় এবং

বিলক্ষণ সম্মান-দক্ষিণা পান। সামান্য রাগ হলেই তিনি প্রতিপক্ষকে বলে দেন—"তুমি কচু জান।" এবং তা তিনি প্রমাণিত করে দেন।

ইনিই হলেন যতীন্দ্রমোহন দত্ত—সংক্ষেপে যম দত্ত। আমাকে তিনি 'ম প ব' বলেন। অর্থাৎ 'মড়ুই পোড়া বামুন'। আরও বলেন—'রা লে'। অর্থাৎ 'রাবিশ লেখক'।

যম দত্ত বললেন—প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছি রাবিশ লেখক।

চমকিত হলাম।—প্রত্যাদেশ! কার!

হ্যাঁ। প্রত্যাদেশ। গতকাল কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ভূত-লগ্নে গঙ্গার ঘাটে গিছলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—গঙ্গার ঘাটে জপ সেরে উঠেই দেখি একটি বিল্ববৃক্ষতলে একটি ছায়া-মূর্তি দাঁড়িয়ে। সাধু সন্ন্যাসী, তাও একেবারে সে কালের সাধু সন্ন্যাসী। ইয়া জটাজুট—ইয়া দাড়িগোঁফ, পরনে কৌপীন, সর্বাঙ্গ ভস্ম লেপন করা; হাতে চিমটা, পায়ে খড়ম, গলায় ইয়া মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক—আর শিঙার মত কণ্ঠস্বর।

ছায়ার মধ্যে অকস্মাৎ যেন আবির্ভূত হলেন তিনি এবং শিঙার মত কণ্ঠে বললেন—বেটা!

আমার প্লীহা—মানে পিলে কোন কালে নেই; কিন্তু ওই কণ্ঠস্বর শুনে পিলেটা আমার পাথরে ঠোক্কর খাওয়া কপালের মত মুহূর্তে ফুলে উঠল এবং ব্যথা করতে লাগল। কোন ক্রমে কেঁদে ককিয়ে সভয়ে বললাম—বাবা!

বাবা বললেন—ডরো মৎ। তারপর বললেন—ও-হো, তুমি বঙ্গনন্দন! মনে ছিল না। ভয় করো না বৎস। আমি ভূতপতি;—

ভয়ে পিলেটা আবার চমকে উঠে আরও খানিকটা ফুলে উঠল; বললাম—ভূ-ত-পতি। শুধু ভূতে রক্ষা নাই—ভূতের রাজা—ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। দাঁতেদাঁতে খটোখটো শব্দ হ'তে লাগল। আমার অবস্থা দেখে ভূতপতি সেই সাধু বললেন—তুমি মূর্খ। বুঝলে না আমি হলাম ভূতেদের পতি, রাজা; অর্থাৎ নন্দী, ভূতভাবন ভবানীপতি শিব ঠাকুরের বডিগার্ড সিপাহ্‌সালার এবং একান্ত সচিব। যিনি দিনে সের-সের সিদ্ধি খান, ভরিভরি গাঁজা খান, বন্দুকের গুলির মত আপিং খান এবং ভূতেদের ধেই ধেই ক'রে নাচান।

আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা ফুঁ দিয়ে দিলেন একটা। বললেন—ফুস ধা! যা রে ভয় উড়ে যা।

বিস্ময়ের কথা তোমাকে কি বলব ভাই, সঙ্গে সঙ্গে ভয় আমার উড়ে গেল! তখন ভূতপতি নন্দী বললেন—দেখ তোমার এক বন্ধু আছে 'কিষ্ণ বন্ন বাম্‌ভন' তুমি বল 'মপব', তার কাছে আমার এক প্রত্যাদেশ নিয়ে যেতে হবে।

আমি বললাম—প্রভু সে কেলে বামুন আপনার কোন্ কর্ম করবে?

নন্দী বললেন—বৎস, এ কর্ম উচ্চ অঙ্কের কর্ম নয়, বিজ্ঞানেরও নয়; এ কর্ম যারা ছড়া পাঁচালী কিম্বা নবেল টবেল লেখে তাদের কর্ম। একখানা বই লিখতে হবে।

আমি বললাম—সে কি বই লিখবে প্রভু? সে তো রালে—মানে রাবিশ লেখক।

নন্দী বললেন—সেই জন্যই ভূতপুরাণ তাকে দিয়ে লেখানো হবে—এই আমাদের বঙ্গদেশ

ভূত সম্মেলনে স্থির হয়েছে। বলেই প্রভু স্লোগান দিয়ে উঠলেন—বম্ মহাদেব টন গণেশ ভেজো সত্তু নূন সমেত। হরহর বোম। অতঃপর মিলিয়ে গেলেন।

যম দত্ত বললেন—আমি হতবাক হতভম্ব হয়ে গেলাম। এই নন্দী বলে কি? ভূতের আবার পুরাণ? রামায়ণ মহাভারত ভাগবত মৎস্যপুরাণ কূর্মপুরাণ চণ্ডী দেবীভাগবত পুরাণ শুনেছি। খানকয়েক পড়েছিও। কিন্তু ভূতপুরাণ? ওরে ভাই, প্রভু অন্তর্যামী, তিনি বলে উঠলেন—অবধান অবধান। শ্রবণ কর। হে যম দত্ত, শ্রবণ কর।

আমি হাত জোড় করলাম, বললাম—বলুন প্রভু।

নন্দী বললেন—দেখ এই ভারত-জগতে বেদ চার, তার সঙ্গে আছে বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি; তৎপর আছে পুরাণ। তুমি ঠিকই মনে মনে স্মরণ করেছ যে সবই ভগবান এবং দেবতাকে নিয়ে। ভূতকে নিয়ে কি পুরাণ হয়? এমনই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু বল তো দত্তপুঙ্গব, সংসারে কাল কয় প্রকার?

বললাম—তিন প্রকার—ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ।

নন্দী বললেন—সাধু—সাধু। ভূত হল আদি, ভূতেরাই হল প্রথম। তার আগে কি আছে বলতো? কিছুই নাই। শূন্য। ফক্কা। জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, ভূতও নাই ভগবানও নাই, সূর্যও নাই চন্দ্রও নাই। নাই নাই নাই, কিছুই নাই। হুঁ-হুঁ। ঠিক বলেছি কিনা, বল? প্রথমেই কিছু না থেকে হল কাল, কালের মধ্যে ভূত কাল হল প্রথম অর্থাৎ আদি। বুঝেচ? তারপর স্থান স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। তখন এলেন তোমার তো ভগবান, ভগবানের ছানাপোনা দেবতা উপদেবতা প্রাণীকুল, মনুষ্যগণ দৈত্যগণ অসুরগণ ইত্যাদি। এই ভগবানের এবং দেবতাদের সঙ্গে দৈত্য অসুরদের যুদ্ধ হয়েছে অনেক। এবং নানা প্রকার কৌশলে এই ভগবান ও ভগবানের বাচ্চারা মনুষ্যকুলের মধ্যে ভেলকি দেখিয়ে নিজেদের মহিমা প্রচার করিয়ে গ্যাঁট হয়ে স্বর্গলোকে বসে মানুষদের পূজো নিচ্ছে, ভোগ খাচ্ছে আর যার যা খুশি করছে। ইন্দ্র নাচ গান শুনছে, বিষ্ণু সমুদ্রের উপর সাপের বিছানা পেতে ঘুমুচ্ছে। শিব সিদ্ধি ভাঙ খেয়ে বোম বোম করে নাচছে। এদের নিয়েই এরা মানুষদের দিয়ে পুরাণ লিখিয়েছে। তাই চার বেদ আঠারো পুরাণের মধ্যে কোথাও ভূতেদের কথা নেই। থাকবার মধ্যে আছে যে ভূতেদের রাজা নন্দী শিবের পেয়াদা। আর যমের সেপাই।

বৎস, শাস্ত্রে বলে পুরাণ অষ্টাদশ অর্থাৎ আঠারো। কিন্তু না। পুরাণ আঠারো নয়, পুরাণ উনিশ। প্রথম পুরাণই হল ভূতপুরাণ। সেই ভূতপুরাণ রচনা করবার জন্য তোমার বন্ধু ওই কিম্ভূত বন্য বাম্‌ভনকেই আমরা পছন্দ করেছি। পুরাণ রচনায় ব্রাহ্মণদের হাতযশ আছে। বেমালুম মিথ্যে কথা সত্যি বলে চালাতে পারে, সুযোগমত দেবতাদের দোহাই দিতে পারে।

অতঃপর যম দত্ত বললে—বুঝেচ না হে কিম্ভূত বন্য বাম্‌ভন, সেই কৌপীন পরিহিত ছাইভস্ম লেপিত অঙ্গ, সেই জটাজুটধারী গঞ্জিকাগন্ধ-নিষিক্ত অঙ্গ ভূতরাজ, শিবের সিপাহ্‌সালার নন্দী মহাশয়ের গায়ের গন্ধে আবার বমি আসতে লাগল। কিন্তু তা বলতে সাহস করলাম না।

বললাম, হে মহাভাগ! আপনার এই মহাতেজ এবং এই ভীষণ নিশ্বাস আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি দয়া ক'রে আসুন। আমি তাকে গিয়ে আপনার প্রত্যাদেশ জানিয়ে আসব।

নন্দী বললেন—তোমার মঙ্গল হোক।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—(এখানে আমি অর্থে লেখক) আপিং সেদিন কতটা খেয়েছিলে?

যম দত্ত বললে—তা ধরেছ ঠিক, সে বেশ একটু বেশীই হয়েছিল। একবার যে আপিং খেয়েছি সেটা যেন মনেই ছিল না। তাই ফের একবার খেয়ে ঝোঁকটা একটু সর-পড়া দুধের মত ঘনই হয়েছিল। সেই আপিংয়ের ঝোঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়েই এই বড় ড্রেনটার ধারে এসে ভেবেছিলাম—ওটা গঙ্গা আর ওই নাম-না জানা গাছটাকে মনে হয়েছিল বেল গাছ। আর কোথাকার কে সাধু এসে এই সব গাঁজা ছেড়ে গেছে।

যম দত্ত বললে—তা যাক। বুঝেচ, কথাগুলোর মধ্যে একটা সার কথা আছে।

বললাম—সেটা কি?

যম দত্ত বললে—সেটা হল এই একটা প্রশ্ন। ভূত আগে না ভগবান আগে? বলতেই হবে ভূত আগে। কারণ ভূতের আগে আর কিছুই থাকতে পারে না। সে ভূতের বাবাও না। সুতরাং ভগবান দেবতা দৈত্য অসুর রাক্ষস মানুষ প্রভৃতির আগে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে শুধু ভূতেরাই ছিল। এই ভূতদের না হারিয়ে কোন মতেই বর্তমান আসতে পারে নি। বর্তমান নিয়ে এসেছে ভগবান। অতএব—

প্রশ্ন করলাম—কি অতএব—

যম দত্ত বললে—মূর্খ কোথাকার। অতএব একটা অতি প্রাচীন অধ্যায় যা সম্পূর্ণরূপে ভূত অধ্যায় তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং রয়েছে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে।

যম দত্ত বলেই গেল,—সারা সকাল আমি ভেবেছি। খুব সায়েন্টিফিক মন নিয়ে ভেবেছি। ভেবে দেখে তবে আমি এখানে এসেছি। এখন আমার আপিংয়ের নেশা নেই। সুতরাং তোমাকে এখন আমি যে পরামর্শ দেব তা আলট্রা মডার্ন।

জিজ্ঞাসা করলাম—সেটা কি রকম?

যম দত্ত বললে—পুরোপুরি যাকে বলে গবেষণা, রিসার্চ কর্ম, তাই। দাঁড়াও আর একবার স্মরণ করে নি।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বাটি দুই-তিন চা, একবাটি কফি, খানচারেক গরম সিঙাড়া তার সঙ্গে সকালের বরাদ্দ আপিংয়ের গুলিটা খেয়ে বললে—দেখ, এ এক যুগান্তকারী গবেষণার দরকার। বলতে গেলে—ধর্ম এবং বিজ্ঞান—ইহকাল এবং পরকাল—জন্ম এবং জন্মান্তর—অদৃষ্টবাদ এবং নাস্তিক্যবাদ—স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম এবং কম্যুনিজম, এক কথায় আলো অন্ধকার, দিন রাত্রি, সমস্ত কিছুর দ্বন্দ্বের বা বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে এই গবেষণায়।

কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে নাকের ছিদ্রে গজানো লোম টানতে টানতে বললে,—দেখ—বলতে

বলাতেই ফ্যাচ্চো শব্দে একটা হাঁচি। তারপর একটা দুটো তিনটে। অবশেষে নাক ঝেড়ে নিয়ে বললে—নাকের রোঁয়া টানলে চট্ ক'রে হাঁচি হয়। এরপর বললে—দেখ এই কর্মটা যদি তুমি করতে পার হে, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যত সব রাবিশ নভেল আর গল্প লিখে কেন পৃথিবীর জঞ্জাল বাড়াচ্ছ বল তো? কাগজ কালি পরিশ্রম নষ্ট, পড়তে মানুষের সময় নষ্ট, পড়ে মানুষের মেজাজ নষ্ট। কষ্টের কথা নাই বললাম। ওর তো আর অবধি নাই। ওসব ছেড়ে দিয়ে এই গবেষণাটা কর। বয়স হয়েছে পরকালের কাজ তো কিছু হল না—তা এটা যদি কর তাহলে বাল্মীকির মরা মরা মরা মরা বলতে বলতে রাম রাম করা হয়ে যাবে।

কথাটা মনে লাগল। উৎকৃষ্ট একটা বিষয় বলে মনে হল। এবং যম দত্তের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাতে আর সন্দেহ রইল না। ভূততত্ত্ব বা ভূতবাদ ও তার সঙ্গে ভূতলোক—

ভূত থাকলে মৃত্যুর মধ্যে জন্মান্তর, নাস্তিক্যবাদের মধ্যে অদৃষ্টবাদ, ইহকালের মধ্যেই পরকাল, বিজ্ঞানের মধ্যেই ধর্ম—এক কথায় নাথিংয়ের মধ্যে এভরিথিং, ভূত থেকে ভগবান—সব প্রমাণ হয়ে যাবে। জন্মান্তর নেবার আগে কর্মফল ভোগ, মানে স্বর্গ নরকে বাস আছে। তার সঙ্গে অদৃষ্ট আছে, কোষ্ঠী আছে; ওরই মধ্যে অদৃষ্ট-না-মানা আছে। তা হলেই হল এই যে—কিন্তু রিসার্চ হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যম দত্ত বার বার ঘাড় নেড়ে শক্ত হয়ে বললে—একেবারে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে সাদা চোখে যা দেখবে তাই। এর বাইরের কিচ্ছুটির স্থান নেই ওর মধ্যে। একেবারে স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর দাঁড়াতে হবে। সোজাসুজি অঙ্কের মত কাণ্ড।

তা তো হবে। কিন্তু তার পথ কি?

* * * *

পথ দত্তই বাতলে দিলেন। ভেবেচিন্তে বললেন—দেখ ভূতেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যা শুনি, তাতে মানুষ ভাল নয়। শুনি, মানুষ মরলে প্রেত হয়। প্রেতেরা ভূতলোকে এসে সেখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে বাস করে। তখন তারা মানুষদের রাজ্যে আসে—ঘোরে ফেরে, গাছে কিংবা ঘরে বাসা গাড়ে। সুযোগ পেলে মানুষের সামনেও এসে দাঁড়ায়। দেখা যায়—কারুর দাঁতগুলো মূলোর মত, কানগুলো কুলোর মত, রঙ পোড়া কাঠের মত কালো, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে আগুনের ভাঁটার মত। মানুষের পিছু থেকে বা আশপাশ থেকে বলে—তোঁর ঘাঁড় ভেঁঙে রক্ত খাঁব। কেউ বা ঘরের চালের সাঙার ওপর বসে গোদ হয়ে ফোলা পায়ের মত পা-খানা নামিয়ে দেয় ঘুমন্ত মানুষের বুকের উপর। কিন্তু সহজে মারতে পারে না। মারতে গেলে ভগবানের স্যাংশন চাই। মানুষের রাজ্যে ফিরে আসতে ভয়ানক ইচ্ছে। কিন্তু মানুষেরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে বাস করতে চায় না, এইজন্যে ওদের ভীষণ রাগ মানুষদের ওপর। ভূতেরা বিচ্ছিরি রকমের বোকা এইজন্যে মানুষেরা তাদের ঠকিয়ে বন্দী করে গোলামির খত লিখে নেয় এবং যা খুশি করিয়ে নেয়। সেই এক নাপিতকে

একভূত পথে একলা পেয়ে তার ঘাড় ভাঙবে বলে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ফিচেল নাপিত চট করে তার কামাবার সরঞ্জাম থেকে আয়না বের করে ভূতের সামনে ধরে বলেছিল —আগে আমার এই চাকর ভূতের সঙ্গে লড়াই কর তারপর আরও আটানব্বুইটা ভূত আছে তাদের সঙ্গে লড়াই কর, তবে আমার সঙ্গে হবে। নিরেনব্বুইটা ভূত আমি বন্দী করেছি। আর একটা চাই—তা' হলেই একশোটা হবে। তখন এই একশোটা ভূতকে আমি রামচন্দ্রের কাছে বলি দিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের মত ভূতসিদ্ধ হব। তখন আমি ভগবানকে তাড়িয়ে নিজে ভগবান হয়ে বসব। বোকা ভূতটা আয়নায় নিজের ছবি দেখে ভাবলে সত্যিই লোকটা ভাঁড়ের মধ্যে নিরানব্বুইটা ভূত বন্দী করে রেখেছে। আর ভয়ে—

* * *

ভয়ে ভূতটা নাপিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল, দোঁহাই আঁপনার পরামাণিক মঁশায়, দোঁহাই আঁপনার বাঁপ দাঁদার, আঁমাকে ওঁই ঝোলার মধ্যে ভঁরবেন না। তাঁ হঁলে দঁম বন্ধ হঁয়ে মরে যাঁব। আমি আপনার চাঁকর হয়ে থাকব, আপনি যাঁ বঁলবেন তাঁই করব।

নাপিত বলেছিল, দেখিস্? দিব্যি গাল্, প্রতিজ্ঞা কর্ যে কখনও কথার খেলাপ করবি না।

ভূত তিন সত্যি করেছিল—করব না করব না করব না।

কি করবি না?

কথার খেলাপ।

তা হলে ফের তিন সত্যি কর যে আমি যা হুকুম করব, তাই করব তাই করব তাই করব।

নির্বোধ ভূতটা তাই করেছিল। বলেছিল—করব করব করব।

অতঃপর মানুষের প্যাঁচে পড়ে ভূতের প্রাণান্ত। প্রাণটা গেল না শুধু ভূতটা প্রাণী নয় ব'লে। নাপিত বলে—যা বেটা আমার মাটির বাড়ির পাশে পড়ো জায়গাটায় রাত্রির মধ্যে পাকা বাড়ি তুলে দে।

ভূত লেগে গেল। ভিত খোঁড়া, ইট চুন সুরকি আনা, কাঠ কাটরা আনা, লোহা আনা, গাঁথনী গাঁথা, পলেস্তারা করা; কাজ তো কম নয়। কিন্তু যতই বেশী হোক করতেই হবে, নইলে নাপিতের সেই ঝোলাটা আছে। সেই ভূতটাকে মনে পড়ছে, ঠিক তারই মত। সুতরাং একরাত্রে বাড়ি বানিয়ে ভোরবেলা নাপিতকে ডাকে—মঁনিব গো মঁনিব—

কে রে?

আমি হুঁজুর, আপনার চাঁকর ভূত।

কি বলিস এই ভোর বেলা?

বাড়ি শেষ হঁয়েছে মঁনিব; রাঁত শেঁষ হচ্ছে আমি মিলিয়ে যাব। তুমি বাড়ি দেখে নাও।

বাড়ি দেখে নাপিত খুব খুশি। খুশি হয়ে বললে—তা হলে এই দিনের বেলা চলে যা

জঙ্গলের মধ্যে, সেখানে সব থেকে ভাল একটা সেগুন আর একটা মেহগনি গাছ কেটে চিরে তক্তা করে ফেল। তারপর সন্ধ্যে বেলা থেকে ফার্নিচার তৈরি করে বাড়ি সাজিয়ে দিবি।

ভূত বললে—আমি খাব কি ?

নাপিত বললে—বনে বাদুড় আছে, চামচিকে আছে, ফড়িং আছে, ধরে খাস।

কি করবে ভূত ? উপায় নাই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; তিন সত্য করেছে। তার উপর নাপ্‌তের ঝোলাকে ভূতের বড় ভয়। তবু বড় রাগ হল। হাজার হলেও সে ভূত। ভগবানদের চেয়েও পুরনো তাদের সভ্যতা। মানুষ তার এমনি নাজেহাল করবে ?

নাপিত কিন্তু মহাধূর্ত। সে ঠিক বুঝে নিলে—ভূতটা যখন হুকুম তালিম করতে ইতস্তত করছে তখন মতলব খারাপ। বেটা যদি তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তবেই তো হয়েছে। এক্ষুণি তালগোল পাকিয়ে মাংসের ডেলা বানিয়ে ফেলবে। সে গম্ভীরভাবে বললে—একটা কাঠের বাড়ি হবে। সেটাই তুই আগে বানা। একশোটা কাঠের কয়েদ ঘর। লোহার শিক দিয়ে কাঠ দিয়ে বানাতে হবে। ভূতগুলোকে বন্দী ক'রে রাখতে হবে। বুঝলি ? বলে কষে এক ধমক দিলে নাপিত।

ভূত ভয় পেয়ে গেল নিদারুণ। এবং তৎক্ষণাৎ ছুটল ব্রহ্মদেশ, সেগুন কাঠের জন্য। এবং রাতারাতি কর্ম হাসিল ক'রে সকালে বললে,—মঁনিব গো মঁনিব, কর্ম হাঁসিল। এবার আমি খালাস।

খালাস ? ওরে ভূত। তোকে তাহলে সর্বাগ্রে বন্দী করব বন্দীশালায়। বলবামাত্র ভূত ভয়ে দিল দৌড়। এবং এরই মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি গজাল মাথায় যে নাপিতকে সাজা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের ভিতর গোটানো লম্বা লেজটা বের ক'রে নাপিতের গলায় জড়িয়ে দিলে। মতলব—টানতে টানতে নিয়ে যাবে, মেরে ফেলবে। নাপিত কিন্তু তার থেকেও চালাক—তার ক্ষুরটা তার সঙ্গেই ছিল। সে ক্ষুরটা খুলে এক টানে কচ্‌ করে কেটে নিল ভূতটার লেজটা। ভূতটা পালাল চীৎকার করতে করতে। এবং গিয়ে উঠল ওই অঞ্চলের ব্রহ্মদৈত্য ভূতের কাছে। বললে—দেখুন, মানুষের হাতে আমার দুর্দশা দেখুন। এর প্রতিকার করুন। না হলে ভূতেদের মানমর্যাদা গেল।

ব্রহ্মদৈত্য ক্রুদ্ধ হয়ে পাঁচশো ভূত পাঠালেন। যাও গিয়ে নাপিতের ঘাড় ভেঙে দিয়ে এস।

সেদিন রাত্রে সন্ধ্যের পরই নাপিতের গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। আশে পাশে যেন কারা খোনা খোনা আওয়াজে ফিস্‌-ফিস্‌ করছে। বাড়ির চারি দিকে, গায়ের চারি পাশে, গাছে গাছে কারা যেন সর্‌সর্‌ খস্‌খস্‌ শব্দ ক'রে নড়ছে চড়ছে। আর যেন কেমন ভূত-ভূত গন্ধ উঠছে।

নাপিত পাঁজি দেখলে। হুঁ—। আজ অমাবস্যা মঙ্গলবার, ভূতলগ্নও আছে আজ। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ক্ষুরটা নিয়ে তার বাড়ির উঠানে যে লম্বা তাল গাছটা ছিল সেই গাছটায় উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পর ভূত-লগ্ন হতেই ভূতেরা হুম্‌হাম্‌ করে নাপিতের উঠানে খুঁজতে এসে লাফিয়ে

পড়ে ভূত নৃত্য জুড়ে দিলে। তারপর খুঁজতে লাগল নাপিতকে। শেষে অনেক খুঁজে যখন দেখলে—নাপিত তাল গাছের মাথায় বসে আছে, তখন তারা নাপিতকে ধরবার মতলবে এ ওর পিঠে চড়তে শুরু করলে। সব থেকে নিচে বসল সেই লেজকাটা ভূতটা। তার উপর তার খুড়তুত ভাই তার উপরে জাঠতুত ভাই তার উপরে কামার ভূত তার উপরে ছুতোর ভূত তার উপরে এ ভূত তার উপরে ও ভূত এমনি ক'রে ক'রে তাল গাছটার মাথা ছুঁইছুঁই করে ভূতের তৈরী আর একটা গাছই যেন তারা তৈরি ক'রে ফেললে। এবং খোনা আওয়াজে হাসতে লাগল হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ। এঁই বাঁর পেঁয়েছি পেঁয়েছি।

নাপিত সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠেছিল—পেয়েছিস? ধর বাগিয়ে বেটাকে। চেপে ধর। যেন না পালায়!

ভূতেরা থ' মেরে গেল!

নাপিত কি বলছে? কাকে চেপে ধরতে বলছে?

নাপিত বিক্রমভরে বললে—স-ব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর। চেপে ধর। জোরসে চেপে ধর।

সঙ্গে সঙ্গে সবার নিচে উপুড় হয়ে বসা সেই বেঁড়ে ভূতটা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে সকলকে ফেলে দিয়ে দে-দৌড়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভূতগুলো হুড়বুড় করে এর ঘাড়ে ওর বুকে ওর পিঠে ঠোকা-ঠুকি করতে করতে মাটিতে আছড়ে পড়ে হাত-পা ভেঙে দারুণ আর্তনাদ শুরু করে দিল।

যম দত্ত বললে—তোমার কাছে লুকোব না ব্রাদার, এই রিসার্চটা এক কালে আমিই আরম্ভ করেছিলাম। আমার বুড়ো ঠাকুরদাদা মাঝে মধ্যে দেখা দিতেন। মানে গণ্ডাকতক টাকা তাঁর কোথায় পোঁতা ছিল। সেইটে কেউ তুলে নিলে কিনা দেখতে আসতেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন—তাইতো নাতি, যে-সব কথা তুমি জানতে চাও সেতো সব হারিয়ে গেছে। যারা জানত তারা ভূতজন্ম থেকে অন্য জন্মে চলে গেছে। তবে যে ভূতটা প্রথম মানুষের কাছে ধরা পড়ে লেজ কাটিয়ে বহু ভূতকে জখম করে মানুষের কাছে ধরিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল সে ভূতটা আছে। তাকে ব্রহ্মদৈত্য শাপ দিয়েছিল—তুই ভূতজন্মে অমর হ'। সেই লেজকাটা অমর বেঁড়ে ভূতটা আজও আছে। তুমি এই বেঁড়ে ভূতটাকেই খুঁজে বের কর।

যম দত্ত বললে—আমি ঠাকুরদাকে বলেছিলাম—ঠিকানাটা জানেন তার? তা ঠাকুরদা বললেন—আমার তো ভাই তোমার মত রিসার্চের শখ ছিল না। আমি ওই শ'কয়েক টাকার মায়াতেই মজে আছি। কখনও কখনও তাকে আকাশ পথে যেতে দেখেছি—ঠিক কালো বড় চামচিকের মত সাঁ করে উড়ে চলে যায়। অন্য ভূতেরা চেঁচায়, বেঁড়ে যাচ্ছে বেঁড়ে যাচ্ছে। ভূতটা চটে। শুনেছি অমর হয়ে ভূতটা গম্ভীর হয়েছে। নাপিতের হাতে নাজেহাল হয়ে, ভূতেদের কাছে শাপগ্রস্ত হয়ে, ভূতটা পণ্ডিত হতে চেয়েছিল। ভূতেদের—সপ্ততীর্থের টোলে শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছিল—সাহেবদের ইউনিভারসিটিতে এম. এস-সি. পাস

করেছিল এবং 'ভূতেদের মুক্তির পথ' বলে মস্ত একখানা বই লিখেছে। সম্ভবতঃ সে এখন ভূতাত্ত্বিক পরমাণু শক্তির যানে ঘোস্ট এটমিক এনার্জির বলে নরক থেকে স্বর্গ, রসাতল থেকে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত স্পেসে ঘোঁস্ট স্পেস-সিপ পাঠাচ্ছে। তার সন্ধান পেলেই বাস—কার্যসিদ্ধি। তুমি সব খবর পেয়ে যাবে। আর ভূতে মানুষে মিলে একেবারে দেবদানবদের দফারফা করে দেওয়া যাবে। এ একেবারে জ—লে—র মত পরিষ্কা—র। বুঝলে তো!

ঘাড় নাড়লাম। —হ্যাঁ বুঝেছি।

যম দত্ত বললে—দেখ এই পর্যন্ত লিখে আমি শুনিয়েছিলাম একটা সাহিত্য সভায়। কিন্তু সাহিত্যিকরা বললে—বাজে। আমি রাগ ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন নন্দী মহারাজ যখন বললে—আর আমার নামও যখন তোমার এই লেখার মধ্যে থাকবে তখন আরম্ভ কর। শুভস্য শীঘ্রম্। আমি পাঁজি দেখে এসেছি। পাঁজিতে রয়েছে—কাল হল ভাদ্রমাস তর্পণের কৃষ্ণপক্ষ, তিথিতে ত্রয়োদশী, পরদিন চতুর্দশী, তারপর দিন অমাবস্যা, একেবারে যাকে বলে ভৌতিক ব্যাপারে মাহেন্দ্রযোগ অমৃতযোগ কম্বাইণ্ড্ টুগেদার। ভূতদের মধ্যে মহাভূত তাল-বেতালের নাম নিয়ে লেগে যাও।

* * * *

শুধু তাল-বেতাল নয়, তার সঙ্গে বেড়ে ভূত মহাশয়ের নাম স্মরণ করে পরের দিনই রওনা হয়ে যাব স্থির করলাম ভোরবেলা। হাওড়ায় ধরব ৭টা ৩৫ মিনিটে আমাদের লুপ লাইনের ট্রেন। উদ্দেশ্য লাভপুরে এসে আমাদের বাড়ির গলিপথটার ঠিক উত্তর দিকে এককালের 'রামাই ভূত' মহাশয়াশ্রিত ভটচার্য বাড়িতে এসে রামাই ভূতের সন্ধান করা।

লাভপুর। বীরভূম জেলার লাভপুর। আমার বাড়ি সেখানে। লাভপুরে চারখানা দুর্গা পূজো হয়, বারোখানা কালী পূজো হয়। শিব আছেন কয়েক গণ্ডা। এ ছাড়া বুড়ো শিব আছেন। এদের সঙ্গে অনেক ভূতের আসা-যাওয়া। তবে তারা আসে আবার চলে যায় দেব-দেবীদের সঙ্গে। এ ছাড়াও অন্য ভূত, যারা এখানে বিশেষ পরিচিত, তারাও কম নয়, সংখ্যায় তারাও অনেক। এদের মধ্যে লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ে বট গাছটায় যে পেত্নীটা থাকত তার নাম তো সেই ছেলে বয়স থেকে শুনে আসছি। সে বটের ডালে দাঁড়িয়ে ডালটা দুলিয়ে দোল খেতো। চট্টরাজদের বাড়িতে একটা ভূত ছিল সেটার ছিল সমস্ত রাত্রি বাড়ির ঘুমন্ত লোকগুলির পায়ে বগলে সুড়সুড়ি কাতুকুতু দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া। প্রথম প্রথম মানুষেরা চমকে উঠে কে কে বলে জেগে উঠলেই সে খিল্ খিল্ শব্দে খোনা হাসি হেসে আরও সুড়সুড়ি দিত। শেষ পর্যন্ত লোকে ভয় না করে গায়ে পায়ে হাত ঠেকলেই হাত-পা ছুঁড়ে ভূতটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিত। তখন সে আবার অন্য পথ ধরে জ্বালাতন করত, বাবলার কাঁটা ভেঙে এনে ফুটিয়ে দিয়ে জ্বালাতন করত। বৈরিগীতলায় বষ্টুম ভূত ছিল। এখানে বৈরিগীদের একটা

খুব ভাল আখড়া ছিল। সেখানে উৎকৃষ্ট বেল গাছ ছিল। লোকে বলত বাদশাহী বেল। এই বেলের লোভে অনেক বষ্টুম ভূত আসত। সকলকে তাড়িয়ে এখানে পাকাপোক্ত মোহন্ত ভূত হয়েছিল সে এক বোষ্টম পণ্ডিত ভূত। তিলক ফোঁটাকাটা মোটা চৈতনওয়ালা মহাপণ্ডিত। শুনেছি তাঁর মত বৈষ্ণবশাস্ত্রে সাহিত্যে পণ্ডিত দেশে দু-চারটের বেশি ছিল না। ক র গ চ শব্দগুলো শুনলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। ক-য়ে কৃষ্ণ র-য়ে রাধা গ-য়ে গৌরাঙ্গ গোবিন্দ চ-য়ে চৈতন্য। মৃত্যুর পর রথ এসেছিল তাঁকে নিতে, কিন্তু তিনি যান নি। বলেছিলেন,—ওহে সারথি, তুমি বাপু রথ নিয়ে ফিরে যাও। আমার কিছু কাজ বাকী আছে, মানে গোটা কতক মামলা চলছে আদালতে। সে কটা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যেতে আমি পারব না। রথ ফিরে গিয়েছিল। বৈষ্ণবপণ্ডিত জীবনকালে শুধু বৈষ্ণবশাস্ত্র নিয়েই কারবার করেন নি—তাঁর আইনজ্ঞান মামলাজ্ঞান ছিল টনটনে। এ চাকলায় ফৌজদারী দেওয়ানী যে মামলাই হোক পণ্ডিত মোহন্ত তার একপক্ষের তদ্বিরে থাকতেনই। বৈষ্ণবশাস্ত্র নিয়ে কথা না বললে তাঁর বুক ধড়ফড় করত, মাথা ধরত। আর মামলা নিয়ে কোন দিন যদি আলাপ আলোচনা না হত তা হলে তাঁর পেট কামড়াত এবং যা খেতেন তার একটি দানাও হজম হত না। সুতরাং মৃত্যুর সময় তাঁর হাতে চার-চারটে মামলা, এ খুব বেশী ব্যাপার নয়। বৈষ্ণবপণ্ডিত ভূত হয়ে দীর্ঘকাল থেকেছিলেন; থাকতেন ওই যে বেল বন, ওই বেল বনের মধ্যে একটা বকুল গাছে। বেল গাছের কাঁটা ফুটত বলে গাছে থাকতেন না। প্রায় রোজই যাতায়াত করতেন সিউড়ি-রামপুরহাট। আদালতের সামনে একটা খোলা জায়গা সর্বত্র আছে এবং সেখানে বট গাছ আছে। সেই বট গাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন; কেউ যদি আইনের পরামর্শ চাইত তা হলে তিনি কূট পরামর্শ দিতেন; ফি সামান্যই, সামান্য বাতাসা-টাতাসা দিলেই হত; প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুদিনে রথ আসত কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েই বলতেন—আসছে বছর এস। তাঁকে তাড়িয়েছিল গঙ্গাতীরের ভূতের দল এসে।

একবার শুনেছি গঙ্গাতীর থেকে এক ঝুড়ি বা চুপড়ি বোঝাই হয়ে ভূত এসেছিল আমাদের গ্রামে। ব্যাপারটা হল এই: আমাদের এখানে 'বৈরাগী আখড়া' বলে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের সেবা ছিল। আর ছিল গোবিন্দ সেবা। এঁদের চারিপাশে ছিল ঝুড়িখানেক শালগ্রামশিলা। মানেটা সেকালে সহজ ছিল, একালে ঠিক সহজ নয়। সেকালে ব্রাহ্মণদের বহু জনের বাড়িতে শালগ্রাম নারায়ণ সেবা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে লোকেরা দেখলে এই গোল নুড়িগুলো 'কুছ কাম্‌কা নেহি'; কেবল পূজো ভোগের ঝঞ্ঝাট বাড়ায়; শালগ্রাম নিয়ে আর ব্যবসা চলে না; লোকে সত্যনারায়ণ করায় না, যাগযজ্ঞি করায় না, তখন তারা লুকিয়ে শালগ্রাম-শিলাগুলি এনে এই আখড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। আখড়া থেকে নিয়ম ছিল যে শালগ্রামশিলা পেলে ওই শালগ্রামশিলার সারিতে বসিয়ে রাখবে, দিনান্তে ছিটিয়ে দেবে কুশের ডগায় গঙ্গাজল, তুলসীর পাতা আর আতপের কণা। আখড়ায় এ জন্য জমি ছিল। এই বৈষ্ণব পণ্ডিতের পরামর্শে সেবায়েৎ একদিন শিলাগুলি ঝুড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে। বাস্ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু অদৃষ্টের বিপাক, সেইখানে ছিল একটা বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের ডালে ঝুলত অনেক বাদুড়। চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচাতো আর উড়ত। এদের মধ্যে ছিল অনেক চামচিকে। এরা কিন্তু আসলে বাদুড় চামচিকে নয়, এরা আসলে হল গঙ্গাতীরে মরতে এসে যারা গঙ্গা পায় নি তাদেরই অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা, ভূত হয়ে ঝুলছে ডালে ডালে। শালগ্রামশিলা ফেলে দিতে ঝুড়িটা যেই না খালি হল—অমনি ঝুপ ঝুপ করে একঝুড়ি বোঝাই হবার মত চামচিকে খসে পড়ল। মানে একঝুড়ি ভূত।

সেই একঝুড়ি বোঝাই ভূত ওই বৈরাগীর মাথায় চেপে এল আমাদের লাভপুর। এবং বৈরাগী আখড়ায় পৌঁছুবামাত্র ফর্‌ফর্‌ শব্দে উড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে বকুল গাছে। বকুল গাছের ডালে বেশ শয্যা রচনা করে ওই পণ্ডিতজী তখন ওই নাকহীন মুখের নাসিকাগহ্বরে বাতাস টেনে নাক ডাকাচ্ছিলেন। এবং স্বপ্ন দেখছিলেন যে শালগ্রামশিলাগুলো গেল, ঝঞ্ঝাট কমল, ওই অনাথ শালগ্রাম সেবার জন্যে যে জমিটা ছিল সেটার আয় থেকে এবার জুৎসই করে মালপো খাওয়া যাবে।

গোবিন্দ হে! কোথায় মালপো! কোথায় সুখ! দু-চারশো চামচিকে পণ্ডিতকে চিঁচি শব্দ করে নখ দাঁত দিয়ে আক্রমণ করলে।

পণ্ডিত সেই যে সেদিন পালাল আর ফেরে নি। এ চামচিকে আকারের ভূতগুলো একবার ঝড়ে ওই বকুল গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় চাপা পড়ে চেপটে লেপটে ফুস—ধা হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও অনেক ভূত আছে।

সে সব এখন থাক। এখন আমি যম দত্তর ছকে দেওয়া লাইনে গবেষণা করব। সকলেই জানেন রিসার্চ ওয়ার্কের নিয়মই তাই, একজনের অধীনে থেকে তাঁরই পরামর্শ এবং নির্দেশমত রিসার্চ করতে হয়। আমার গবেষণা হল যম দত্ত মহাশয়ের অধীনে। তাঁর নির্দেশ হল রামাই ভূতের সূত্র ধরে কাজ আরম্ভ কর।

রামাই ভূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সে আজকের কথা নয়—আমার ঠাকুরদাদারা তখন ছেলেপুলে মানুষ। সে ধরুন গিয়ে একশো চল্লিশ বছর আগের কথা। সে সময় রামাই ভটচাজ ছিলেন একেবারে ভরাভর্তি জোয়ান; ভটচাজ বাড়ির এই জোয়ান ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল 'নিশি'তে। নিশিও একরকম ভূত। তারা রাত্রে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় চেনা মানুষের গলায় ঘুমন্ত মানুষের নাম ধরে ডাকে। ঘুমন্ত মানুষ ঘুম ভেঙে উঠে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় একটু দূরে তার একজন চেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে চলতে থাকে, এ লোকটিও চলে। অনেক দূর এসে কোন খালে বা বিলে ডুবে কিংবা শক্ত মাটিতে কি পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ে মরে এবং ভূত হয়। রামাইয়ের নিশি ভয়ানক নিশি, সে থাকত গোয়াল ঘরে। রামাই তার ডাকে বেরিয়ে এসে গোয়াল ঘরে ঢুকে গোরুর দড়ি গোয়ালের সাঙায় বেঁধে তাইতে গলায় ফাঁস পরে মরেছিল। অতঃপর রামাই আমাদের অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভূত হল। এবং নিজের বাড়িতেই তার বাসা গাড়লে। উঠানে একটি নিম গাছ ছিল সেই গাছ হল তার

বৈঠকখানা, বাড়ির বড় ঘরের চালের সাঙায় হল তার শোয়ার ঘর। ভূত হয়েও সে বাড়িরই একজন হয়ে রইল। রামাইকে নাকি দিনে রাত্রে যখন তখন দেখা যেত। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদারাও তাঁকে দেখেছেন। তাঁরা বলতেন, রামাইদাদা, আমাদের ভয় দেখিয়ো না। রামাই বলত,—নাঁ-নাঁ চঁলে যা। নির্ভয়ে চঁলে যা! আমার দিকে তাকাস না। আমি কাজ করছি। রাত্রে সে গোরুদের খেতে দিত। ঘরদোর ঝাঁট দিত। বাড়ির দোরে একটা কলকে ফুলের গাছ ছিল সেটায় চড়ে টাটকা কলকে ফুল তুলে চুষে চুষে মধু খেত। বড় যে নিমগাছটা ছিল উঠোনে, সেই গাছটার নিচের একটা ডালে দাঁড়িয়ে সেই ডগার একটা ডাল ধরে হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো মারি বলে দোল খেত।

বড়দাদা নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীর কোলে তখন খোকা হয়েছে! বাড়িতে মেয়েছেলে বলতে নবকৃষ্ণের স্ত্রী মানদা আর বিধবা বোন চণ্ডীদাসী; একজন রান্না করত অন্যজন ঘরে শালগ্রাম সেবার কাজ থেকে অন্য সব পাটকাম করত। ছেলেটি ঘরে কি দাওয়ায় বিছানায় শুয়ে ঘুমুতো; হঠাৎ ঘুম তার ভাঙত, হয় তো গায়ে দুধের বা তেলের গন্ধ পেয়ে খুদে পিঁপড়ে এসে কামড়াতো, নয় তো ছোট মাদুর বা বিছানায় উঠে-থাকা কোন কাঠির খোঁচা লাগত, নয়তো দেয়ালা করার মধ্যে স্বপ্নে ভয় পেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠত। মায়ের আসতে দেরি লাগত কারণ ভটচাজ বাড়িতে লোকের কাজ থেকে দেবতার কাজ বেশি। তারপর গোরুবাছুর আছে। মায়ের ছুটে আসা সম্ভবপর হত না। তখন রামাই নিম গাছের ডাল বা ঘরের সাঙা বা কলকে ফুলের গাছ বা গোয়াল ঘর যেখানেই থাকত সেখান থেকে দুই হাত ল—ম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে (সাঁতারুরা যেমন ভাবে ডাইভ করে তেমনি ভাবে আর কি!) সাঁ করে এসে হাজির হত ছেলেটির কাছে এবং উপরের সাঙায় বসে লম্বা হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে তুলে নিতো! বাচ্চা কচি ছেলে তার ভূতের ভয় ছিল না। ভূত আর মানুষে ঠিক তফাত করতে পারত না—সে কোল পেয়ে চুপ করত। রামাই তাকে দোলা দিতে দিতে আদর করে ফিসফিস খোনা আওয়াজে বলত আঁ হা রেঁ জিঁভে আমার জল সরছে, কঁচি-কঁচি মাংস তাঁজা-তাঁজা রক্ত, ইচ্ছে কঁরে ঘাড় মটকে চুষে খেঁয়ে নি। কিন্তু দাঁদার ছেঁলে বংশধর, পিণ্ডি দিবি আমাকে, তোঁর ঘাড় কিঁ কঁরে ভাঙি।

ছেলেটা এর মানে বুঝত না ফিকফিক করে হাসত।

বউদি এসে দেখত বিছানায় ছেলে নেই—ছেলে সাঙার কাছে শূন্যে দোল খাচ্ছে। রামাইকে সে দেখতে পেতো না। অনুমানে বুঝত রামাই দোলাচ্ছে। তখন বলত ঠাকুরপো খোকাকে নামিয়ে দাও ভাই। ওর খিদে পেয়েছে দুধ খাওয়ার।

রামাই সুড়সুড় করে নামিয়ে দিত ছেলেটিকে।

রামাই একটি শর্ত করিয়ে নিয়েছিল বউদিকে। শর্ত করিয়ে নিয়েছিল এই ছেলে যেন বড় হয়ে কখনও গয়া না যায়।

বউদি জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ঠাকুরপো?

খোনা আওয়াজে রামাই বলেছিল—ন্যাকা আমার। জাঁনো না বুঝি?

কি জানি না ?

জানো না গয়ায় পিণ্ডি দিলে ভূতজন্ম থেকে মুক্তি হয় ?

তা তো ভাল গো !

ভালো ? তাহলে তো মানুষের মরণও ভালো। মুক্তি হয়। দোঁব নাকি তোমার ঘাড়টা ভেঙে ?

ভয় পেয়ে বউদি বলত—দোহাই ভাই, তোমার পায়ে পড়ি।

পায়ে পড়ি। কেন—মানুষজন্মে কত হাঙ্গামা বল তো ? খাওয়া-দাওয়া, বিষয় সম্পত্তি করা, চাষবাস, পুজো-আর্চা, ঝগড়াঝাঁটি—

না ভাই। তবু মনুষ্যজন্ম সুখের—

রামাই ধমক দিয়ে উঠত—চুঁ—প—বলছি ! ভূঁতজন্ম আঁরও সখের ! স্বঁগ্‌গেও এত সুঁখ নাই। হুঁ—হুঁ !

বলেই না কি রামপ্রসাদী সুরে গান ধরে দিত—

মন, তুমি আঁসল খঁবর জাঁনো না—
ভূঁতজন্ম সুঁখ-জন্ম, বিনি আঁবাদে ফলে সোনা।
গাছের ডালে ঘরের কোণে
শ্মশানে মশানে বনে
বাসা বাঁধো রান্না রাঁধো
শুধু লঙ্কাতে সম্বরা দিয়ো না,
যেথায় খুশি সেথায় যেয়ো,
শুধু অযোধ্যার ধারে যেয়ো না।

গানটাই শোনা যেত, রামাইকে দেখা যেতো না, দেখা যেতো ভটচাজ বাড়ি থেকে খাড়া পশ্চিম দিকে প্রায় শ' পাঁচেক হাত দূরে শা পুকুরের পাড়ের উপর যে শ-খানেক হাত উঁচু শিমুল গাছটা আছে, সেই গাছটার মগডালটা বিনা বাতাসে একেবারে ভেঙে পড়বার মত ঝাপটা খেলে কিছুর। সেকালের লোকে এর মানে বুঝত। তারা বলত—রাম রাম রাম রাম। কেবল রামাইয়ের বউদি জানত এ হল রামাই। মনের আনন্দে এখান থেকে এক-লাফে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে গাছটার উপর। গাছটা হল গ্রামটার মধ্যে ভূতদের একটা পার্ক বা বেড়াবার হাওয়া খাবার জায়গা।

বউদির সঙ্গে বনত রামাইয়ের কিন্তু বোনের সঙ্গে বনত না। বোন চণ্ডীদাসী বালবিধবা। ভূতকে সে অপবিত্র ভাবত—ঘেন্না করত, বলত—মহাপাপী ছিলি ছোড়দা তুই। রাত্রে বিছানায় শুয়ে চণ্ডীদাসীর কথা বলবার অবকাশ হত। চণ্ডী থাকত মেঝেতে শুয়ে, রামাই থাকত সাঙায়—অবশ্য তাকে দেখা যেত না।

রামাই ধমক দিত—চুঁ—প।

কেন ? চুপ করব কেন ? পাপ না করলে ভূত হলি কেন তুই ?

সে গলায় দঁড়ি দেওয়ার জন্যে।

তাই বা দিলি কেন ?

নিঁশি ভূঁতে দেওয়ালে যে।

তুই দিলি কেন ?

বললে যে খুঁব মজা হবে।

মজা হবে। দেখছিস মজা ?

দেখছি না ? তুঁই দেখছিস না ?

কি দেখব ? দেখবার কি আছে ?

তঁবে দেঁখ।

কি ?

দেঁখ না ওঁপরের দিকে চেঁয়ে।

চণ্ডীদাসী দেখত—সাঙার উপর থেকে থামের মত একখানা পা আস্তে আস্তে নেমে আসছে তার বুক বরাবর। কিন্তু চণ্ডীদাসী ভয় পায় না, সে দিব্যি সেই থামের মত পা-খানাকে বলে—নাম্ নাম্—নাম্ দেখি। এই পা।

পা কিন্তু নামতে পারে না। থেমে যায়।

সাঙার উপর থেকে কথা ভেসে আসত—ওরে চণ্ডী ওরে মুণ্ডী তোঁর মত বঁদমাশ আমি দেঁখিনি। মঁনে মঁনে সেই দাঁশরথ রাঁজার বেঁটার নাম কঁরছিস।

পা-খানাকে সে জোরে দোলাতে থাকত। সে দোলায়মান পা-খানার এক লাথি খেলে চণ্ডীদাসী যে চেপ্‌টে যাবে এতে কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

বউদি বলত—ও চণ্ডী ক্ষমা চা ভাই। ও চণ্ডী।

কাকে বলছ ? চণ্ডী সেই কথা শুনবার মেয়ে। সে কি করত, এই মস্ত হাঁ করে দাঁত মেলে বিছানায় উঠে বসত এবং বলত কামড়াব তোর পায়ে।

আঁ—।

পা-খানা সড়াৎ করে গুটিয়ে যেতো ফুটো হয়ে যাওয়া লম্বা বেলুনের মত। চণ্ডীদাসী খিলখিল করে হাসত। তবে মধ্যে মধ্যে অতর্কিতে ছরছর শব্দে বালি ছিটিয়ে দিয়ে কিংবা কখনও পিঠের ওপর গুম্ করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে অথবা চণ্ডীর মাথায় গোবরের তাল ফেলে দিয়ে তাকে জব্দ করত রামাই।

রামাই ভয় করত আর খাতির করত দাদাকে। দাদা যজমান, বাড়ি যেতো চাল কলা মিষ্টি মণ্ডা ফলমূল বেঁধে নিয়ে ; পিছন পিছন রামাই পাহারা দিয়ে নিয়ে আসত বাড়ি। তবে দাদার সামনে কখনও যেতো না। দাদা তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াবার সময় বাখারি দিয়ে পিটত। এবং বরাবর পিছন থেকে হঠাৎ কান চেপে ধরত। ওই ভয়ে সামনে আসত না। রামাই।

দাদা একলা মানুষ, চাষের সময় বলত—রামাই, মাঠের খোঁজ একটু রাখিস। একলা

মানুষ। এবার টানের বছর, দেখিস যেন চুরি করে জল কেটে না নেয়।

রামাই সারারাত্রি জমির চারিধারে ঘুরে বেড়াতো। একবার চাষী সদ্‌গোপদের ভীমের মত জোয়ান বহুবল্লভ, ভটচাজদের জমির জল চুরি করে কেটে নিতে এসে দেখেছিল—সেখানে একটা আচমকা তাল গাছ দাঁড়িয়ে। আচমকা মানে অচেনা, অর্থাৎ তাল গাছ সেখানে ছিল না; আচমকা অচেনা তাল গাছটাকে দেখে বহুবল্লভ থমকে দাঁড়িয়েছিল। এ তাল গাছ এল কোত্থেকে?

তাল গাছটাই উত্তর দিয়েছিল—আঁয় নে, জল কাঁট।

বহুবল্লভ সাহসী এবং বলবান। সে বলেছিল—কে রে তুই?

আমি রামাই।

এবার বহুবল্লভ চোঁ-চা দৌড় দিয়েছিল। রামাই তার বাড়ি পর্যন্ত ধঁর ধঁর ধঁর বলে ছুটে এসেছিল পিছন পিছন।

লোকে বলে রামাই নয়। এটা ছিল ওর ওই দাদা নবকৃষ্ণের কাজ। রামাই ভূত হয়েছে এই কথা রটনা যখন হল তখন সে মধ্যে মধ্যে তেলকালি মেখে ভূত সেজে এইভাবে মাঠে নিজের জল রক্ষাও করত আবার পরের জল চুরি করেও নিত।

তা বলুক লোকে। সে লোকেরা নিন্দুক লোক। নাস্তিক লোক। ও কাজ রামাইয়ের। রামাই ছিল অসাধারণ ভূত। বাড়ির হিতৈষী ভূত। তার প্রমাণ আছে। রামাই একবার বউদি আর বোন চণ্ডীদাসীর অনুরোধে রাসের সময় কান্দীর রাজবাড়ি থেকে একঝুড়ি মালপো একঝুড়ি মেঠাই একঝুড়ি রাধাপ্রসন্ন কৃষ্ণপ্রসন্ন মিষ্টি এনে খাইয়েছিল। ব্যাপারটা বলতে হয় নইলে পরিষ্কার হবে না। সে বছর রাসের দিন দুই ননদ ভাজে গল্প করছিল কান্দীর রাজবাড়ির রাসের খাওয়ার সমারোহের।

কান্দী রাজবাড়িতে রাধাবল্লভ ঠাকুরের নিত্যভোগেই এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একান্ন পদের ব্যবস্থা; সেই অবস্থার উপর বিশেষ ব্যবস্থা রাসযাত্রা পর্বে। দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ব্যাপার। খেতে বসে পদের পর পদ খেতে লোকের পেট ভরে উঠে এমন চড় চড় করে যে, হেউ ঢেউ শব্দে চারিদিক ভরে যায়। দু-দশজন ত্রাহিত্রাহি, ত্রাহি মাম্ পুণ্ডরীকাক্ষ বলে গড়াগড়ি খায়।

বউটির বাপের বাড়ি কান্দীর কাছে, সেই গল্প বলছিল। বলছিল এমন মালপো মনোহরা আর রাধাপ্রসন্ন কৃষ্ণপ্রসন্ন মেঠাই আর কোথাও হয় না ভাই ঠাকুরঝি। প্রতিবার বাবা রাসের সময় কান্দীর রাজবাড়ি থেকে ছাঁদাতে নিয়ে আসত।

চণ্ডীদাসী বলেছিল,—আমি ভাই কখনও খাই নি।

বউ বলেছিল,—আমি খেয়েছি, কিন্তু আরও খেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কে খাওয়াবে বল? তোমাকে কি বলব, মনে পড়ে নোলা সপ্‌সপ্ করছে।

ঘরে সাঙার উপরে চালের নীচে এক টুকরো খোনা হাসি বেজে উঠেছিল—হিঁ—হিঁ হিঁ।

চণ্ডী বলেছিল—এই। কি হাসছিস তুই ছোড়দা। ভারী তো ভূত হয়েছিস। শুধু ঝুঁটি ধরে টানতেই পারিস। কই খাওয়া না দেখি। মনোহরা মালপো ফেষ্টফসন্ন-টসন্ন না কি বলছে বউ, সেই মিষ্টি।

কেষ্ট কি প্রসন্ন নাম করতে পেতো না চণ্ডী; কেষ্টদাসী নাম ছিল চণ্ডীর শাশুড়ীর আর প্রসন্নকুমার নাম ছিল স্বামীর। তাই বলেছিল ফেষ্টফসন্ন। যাক সে কথা। এখন যা হয়েছিল তাই বলি। ঘরের ভিতরে যেন একটা দমকা বাতাস উঠল এবং ঘরের দরজা দড়াম শব্দে ঠেলে খুলে বেরিয়ে গেল; হাওয়াটা পাকাতে পাকাতে নিম গাছটার গোড়ায় গিয়ে গাছটার কাণ্ডটাকে ঘিরে পাক দিয়ে ডালপালায় ঝড়ের মত ঝটপটানি জাগিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সেই মগডালে উঠে সেখান থেকে মাথার উপরে আকাশ কাঁপিয়ে (আজকাল-কার জেট প্লেনের মত) একটা গোঙানী শব্দ তুলে ঝপাং শব্দে গিয়ে পড়ল শিমুল গাছের মগডালে—সেখান থেকে আর একটা শব্দ।

চণ্ডীদাসী বলেছিল—কারণ। রকম দেখ। ভূতের কি সবই বিটকেল, যাচ্ছে তারই বিটকেলেমি দেখ তো।

এ বিটকেলেমি তো যেমন তেমন। এরপর যে বিটকেলেমি করলে রামাই তা শুনেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। আধঘণ্টা হবে, তারপরই চালের উপর সে যেন চার চারটে বীর হনুমানের সমান ওজন নিয়ে দমাস শব্দে লাফ খেয়ে পড়ল। পড়ল পড়ল একেবারে আচমকা পড়ল। চণ্ডীদাসীদের গল্প তখন সদ্য শেষ হয়েছে। চুপ করেছে। এই শব্দে দুজনেই চমকে উঠে—বু বু বু বু শব্দে কেঁদে উঠেছিল।

চালের উপর তখন মচ্‌মচ্‌ শব্দ উঠতে শুরু করেছে। চাল যেন ভেঙে পড়বে। তারপরই তাদের চোখে পড়ল চাল থেকে ঠিক মধ্যি উঠোনে এসে নামছে একটি গোদা পা, তা পা-খানা প্রায় নিম গাছের ডালের মত বা তাল গাছের মত তো হবেই। তার পরই আর একটা পা, ক্রমে দুটো পায়ের উপর গোটা একটা মূর্তি। মূর্তিটা একেবারে মিশকালো। তবে গায়ে তার অসংখ্য জোনাকি পোকা লেগে রয়েছে এবং শরীরের রেখায় রেখায় লেগে দিপ্‌-দিপ্‌ করছে। পূর্ণিমার রাত্রি—জ্যোৎস্নায় সব ফট্‌ফট্‌ করছে—তারই মধ্যে জোনাকি পোকা-খচিত ওই অপূর্ব কালো মূর্তিটা উঠোনে দাঁড়াল; তার মাথার উপর ঝুড়ির গন্ধমাদন—চার চারটে ঝুড়ি থাকবন্দী সাজানো। আর তার থেকে কি সুবাসই না উঠছে। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। মূর্তিটা ক্রমে খাটিয়ে গুটিয়ে মানুষের মত হল এবং চারটে ঝুড়ি মাথায় বয়ে ঘরে এসে ঢুকে নামিয়ে দিলে—নে—খা। একেবারে টাটকা। উনোন থেকে নেমেছে আর তুলে এনেছি। খা। বলেই চণ্ডীদাসীর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে দুম্‌ শব্দে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে লাফ মেরে ঘরের সাঙার উপর পা ঝুলিয়ে বসে খোনা গলায় গান ধরে দিয়েছিল।

মা গো আঁমায় বাঁচিয়ে রাঁখো।
এই ভূঁতজন্মে মা—জঁন্মে জঁন্মে চিঁ-রো জন্ম বাঁচিয়ে রাঁখো
ইন্দ্র-চন্দ্র-দেবতা দেখে মানুষ দেখলাম লাঁখো লাঁখো—

সব ফেলে মা ভূতভাবনের বুকেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকো—
মা গো আমায় বাঁচিয়ে রাখো—এই ভূতজন্মে।
ভূতের কত সুখ বলো মা—দুখ নাইকো তিন সীমানায়
অমাবস্যার ভূতের নাচন—নাচছি দেখো মা আজকে রাস পূর্ণিমায়,
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং—নাচ—ছি দেখো পূর্ণিমায়।

সে গান সে দিন সকলে শুনেছিল এ গ্রামের। এমন খোনা মিষ্টি গলা আর কেউ কখনও শোনে নি। শুনেছিল আর দেখেছিল নিম গাছটার ডালে পাতায় জোনাকি পোকাগুলো ছুটে গিয়ে নিভে যাচ্ছে। তার মানে রামাই জোনাকি পোকাগুলো ধরে ধরে খাচ্ছিল।

চণ্ডীদাসী জিজ্ঞাসা করেছিল, ও-গুলো খাচ্ছিস কেন? মা গোঃ!

রামাই বলেছিল, জোনাকি পোকা ভূতের জিভে ভারী মিষ্টি আর জোনাকি পোকা খেলে ভূতের রং ফরসা হয়।

চণ্ডীদাসী বলেছিল, তার চেয়ে জোনাকি পোকা দিয়ে গয়না করে পরিস সেই তো ভালো!

রামাই বলেছিল, তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরে পেতনী হবি? আমি তোকে জোনাকি পোকার গয়না গড়িয়ে দেব।

* * *

রামাইয়ের নামে একটা অপবাদ ছিল। লোকে বলত রামাই তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে অবস্থাপন্ন কালীবাবুর বাড়ির দরজায় রোজ ময়লা লেপে দিত। রামাইয়ের সঙ্গে কালীবাবুর ঝগড়া ছিল। রামাই বলত—না। ধেৎ! ওই আমার কাজ হয়? আমি বামুনের ছেলে—আমারই ব্রহ্মদৈত্যি হবার কথা, তা সংস্কৃত পড়ি নি শাস্ত্রকাজ করি নি—সন্ধ্যে আহ্নিক করি নি বলে ভূত হয়েছি। ও কাজ ভূতে করে না। বিশেষ করে বামুন ভূতে। ও হল পেরেতের কাজ। এক বেটা পেরেত থাকে কালীবাবুর পায়খানায়। সেই বেটা ময়লা মাখায় কালীবাবুর দরজায়। কালীবাবুর শিউলি গাছে আছেন ব্রহ্মচারী, পেরেতটা তারই চাকর।

* * *

অতঃপর লাভপুরে পৌছানো।

হাওড়া স্টেশন হতে ১১১ মাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন। জংসন স্টেশন। সেখান থেকে ৮ মাইল দূরে লাভপুর। সকালে সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে ১১।।টায় আমদপুর, সেখানে নেমে ছোট লাইনের ট্রেনে লাভপুর। ভোরবেলা যখন হাওড়া রওনা হব তখন আমার শোবার ঘরের জানালার ধারের সেই বেল গাছটার ডালগুলো খুব দুলতে লাগল। ট্যাক্সিতে চড়ছি ঠিক সেই সময়ে মনে হল যেন কেউ শিঙে বাজিয়ে দিল—ভোঁপো ভোঁপো ভোঁপো শব্দে। শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গাছটার দিকে তাকালাম। কেউ যেন মনে হল বললে, কিছু ভয় নাই, চলে যাও। আমি সব খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে?

কেউ যেন বললে—আমি এই বেল গাছে আছি। এই গাছের ডালের উপর তোমার জন্যে আস্তানা তৈরি করাচ্ছি। ভূতপুরাণ যদি উদ্ধার করতে পার তবে এই বেল গাছে তোমার স্কাইস্ক্রেপার তৈরি হয়ে যাবে।

যথাসময়ে লাভপুর পৌঁছুলাম। নতুন কালের লাভপুর। আসছি প্রায় দু' যুগ পর। মানে চব্বিশ বছর। অবশ্য দুদিন-চারদিনের জন্যে বা একদিন-আধদিনের জন্যে মধ্যে মধ্যে যা এসেছি সেগুলো ধরছি না। কারণ এসেছি কোন কাজে, সে কাজ সেরেই চলে গেছি। কারুর কোন খোঁজ করি নি। বাড়িতে মা ছিলেন, তাঁকে প্রণাম করেছি কথা বলেছি। বাড়ির দেবতারা আছেন ; তাঁদের ঘরের সামনে গিয়ে এক প্রণামে প্রণাম সেরে চলে এসেছি। কোন কথাই বলি নি। এমন কি—রক্ষা কর কি রাজা কর কি লটারীর টাকা পাইয়ে দাও তাও বলবার কথা মনে হয় নি। দেবতারা তো বোবাই, তাঁরা কথা তো বলেনই না। মানুষদের খোঁজও করি নি। ভূতদের খোঁজ তো দূরের কথা। বাড়ির পাশেই কালীবাবুর বাড়ি। বাড়িটাতে এখন লোক নেই, বন্ধ থাকে দরজা। ওদিকে তাকাই নি। তাকাবার কথা মনে হয় নি। কোন গন্ধও পাই নি। কেউ ঢেলাও ছোঁড়ে নি। সুতরাং ওদের কথা, মানে ভূতেদের কথা, মনেই হয় নি।

এবার প্রথমেই রামাইএর খোঁজে ভটচাজ বাড়ির দিকে তাকালাম। বড় নিম গাছটা, যেটা সেই প্রাচীন কালের, সেটা নেই দেখলাম। কালীবাবুর বাড়ির বন্ধ দরজায় কোন প্রকার ময়লা মাটির চিহ্ন নাই ; খুব টেনে টেনে নিশ্বাস নিয়েও কোন গন্ধ পেলাম না। কালীবাবুর বাড়ির যে শিউলি গাছটায় ন্যাড়া ব্রহ্মচারী থাকত সে গাছটাও মরে গেছে। ওদের বাড়ির পাইখানাটা যেটার মধ্যে ওই পেরেতটা থাকত সে পাইখানাটা ভেঙে একেবারে ঢিবি হয়ে গেছে। আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

কি বিপদ।

তা হলে এরা গেল কোথায় ?

তিন

সন্ধ্যাবেলা মনে হল নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছি, নিজের বিপদ নিজে ডেকেছি। এ প্রায় তেপান্তরের মাঠে প'ড়ে পথ হারানোর মত ব্যাপার। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। ভূতের 'ভ' পর্যন্ত উপে গিয়েছে। কোথাও কোন হদিস পাওয়া যায় না। বড় বড় গাছগুলো, রামাইয়ের নিম গাছ, শাহ পুকুরের শিমুল গাছ, বাঁধির বট গাছ, লালুকচাঁদার বট গাছ, বৈরাগীতলার বকুল গাছ, শ্যামাপদ ময়রার ভাঙা দালানবাড়ি, পাথুরেপুকুরের ভাঙা ঘাট, জেলেপাড়ার ছাঁচতলা, সদগোপদের ঢেঁকিশাল, মকবর ঢিবির কবরের পর পাশে জন্মানো ঝোপঝাড়গুলো, মৌলকিনীর তাল গাছগুলো, বাঁশঝাড়তলা এ-সবের প্রায় কোনটাই আর নেই। কাটা পড়েছে, ভেঙে পড়েছে অথবা আপনা-আপনি মরে গেছে। নিম গাছে রামাই থাকত।

শিমুল গাছ ছিল সকল ভূতের বারোয়ারীতলা, লালুকচাঁদার বট গাছে থাকত ফনা পেতনী, বৈরাগীতলার বকুল গাছে থাকত তেলক-কাটা বোষ্টম পণ্ডিত ভূত। জেলেপাড়ার জেলেদের বাড়িগুলোর ছাঁচতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত এক বিধবা পেতনী। যে কেউ জেলেদের বাড়ি থেকে মাছ কিনে নিয়ে যেত তারই পিছন পিছন সে চলত আর বলত, এঁক টুক্‌রো মাঁছ দেঁ রে। এঁই এঁতটুকু এঁক টুকরো।

বলতে ভুলেছি, জেলেপাড়ার মাঝখানে ছিল কৈবর্তপুকুর। এই পুকুরে রাত্রে চবাং চবাং শব্দ তুলে দশ-পনেরটা শাঁকচুন্নী মাছ ধরে ফিরত। মাথায় দড়ি দিয়ে খাড়ুই বেঁধে, গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরে, চাবি জাল অর্থাৎ বাঁশের গোল ফ্রেমেগাঁথা জাল নিয়ে চাপা দিয়ে দিয়ে মাছ ধরত। কখনো সকলে মিলে গান করত খোনা সুরে, কখনো কথাবার্তা বলত, কখনও ঝগড়া করত। গান করলে মনে হত শীতের দিনে কুকুরের বাচ্চা কাঁদছে। কথা-বার্তা বললে মনে হত এক ঝাঁক শালিকপাখি মিলে কিচিরমিচির করছে। ঝগড়া করলে মনে হত পাঁচ-সাতটা বেড়াল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে এঁ্যাও—এঁ্যা—ও করছে। তারপর সে এক ছেঁড়াছিঁড়ি ব্যাপার। খঁও-খঁও-খঁও-খঁও ব্যাপার। আর বেশী আনন্দে গান গাইলে মনে হত গ্রীষ্মকালের রাত্রে খানদশেক গোরুর গাড়ি চলেছে, তাদের তেল শুকিয়ে যাওয়া চাকায় কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা-কাঁচোর-কঁ্যাচ-কঁ্যাচোর কঁ্যাচ শব্দ উঠছে।

ওই যে পেতনীটা, যেটা নাকি জীবনকালে বিধবা হয়ে চুরি করে মাছ খেয়ে পেতনী হয়েছিল, যেটা জেলেদের ছাঁচতলায় থাকত, সেটা ওই শাঁকচুন্নীদের অপেক্ষায় পুকুরপাড়ে বসে থাকত আর শাঁকচুন্নীদের তোষামোদ করত। বলত, আঁহা বোঁন কিঁ সুঁন্দর তোঁমাদের গলা! শাঁকচুন্নীরা বলত, মঁর-মঁর-মঁর মাঁছখাগী বিধবা, লুঁভিষ্টি, পাঁপিষ্টি! তোঁর মঁতলব সঁব বুঁঝি।

সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল শুরু হত দুই পক্ষে। একপক্ষে এই বিধবা পেতনী একা, অন্যদিকে দশ বারোটা শাঁকচুন্নী।

কোন দিন শাঁকচুন্নীরা সকলে মিলে ওই পেতনীকে চুলের মুঠোয় ধরে যে যেমন পারত সে তেমনি মার দিত। আর পেতনীটা চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে তারস্বরে চীৎকার করত। মনে হত কোনো বনবেড়ালে কোন প্যাঁচা বা বাদুড় ধরেছে, আর সেটা চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে চ্যাঁচাচ্ছে, বাঁবারে মাঁরে মঁলামরে বাঁচারে বাঁচারে!

কখনো কখনো নাকি এ-ঝগড়া এ-লড়াই দু-তিনদিন ধরে চলত। দিনের বেলা শাঁক-চুন্নীরা সব কাক হয়ে যেত আর এই মাছলোভী বিধবা পেত্নীটা হত একটা বেড়াল। বেড়ালটা লুকিয়ে থাকত এই পুকুরপাড়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে, তার সঙ্গে যোগ দিত লালুকচাঁদার বট গাছের ফণা পেতনী; বট গাছটার চারিপাশে কাকেরা উড়ত; পেতনী ফণা একটা গোখরো সাপ। আরও যোগ দিত শ্যামাপদ ময়রার ভাঙা দালানের চিলেকোঠার পেতনীটা। এই পেতনীটা একটা কোন ইতর পেতনী ছিল, ওই কালীবাবুর পায়খানার প্রেতটার মত রীতকরণ ছিল তার। সারা বাড়িময় ময়লা নিয়ে যেন চালুনীর উপর বড় বড় বড়ি বসিয়ে যেত। সব থেকে

বেশি উপদ্রব করত উনোনশালে রান্নার উপর; রান্নার হাঁড়িতে কড়াইয়ে ফুটন্ত ভাত তরকারীর উপর ময়লা ফেলে দিত।

পুলিস পাহারা রেখেও কোন প্রতিকার হয় নি। পুলিস কি পাহারা বসালে পেতনী তখন শ্যামাপদ ময়রার পাগলী মেয়েটার মাথায় ভর করত। সে সর্বাঙ্গে ময়লা মেখে দুই হাতে ময়লা নিয়ে পাহারাওলা বা পুলিসকে বলত, আতর মাখবে? আতর? একশো টাকা ভরি। শাঁকচুন্নী পেতনীর লড়াইয়ে সেও এসে যোগ দিত। লোকে বলে মেয়েটা ময়লা মেখে একটা ঝাঁটা নিয়ে ওই কাকগুলোকে তাড়াত আর বলত ধাঁ-ধাঁ-ধাঁ-ধাঁ। আশ্চর্যের কথা, কথা তার খোনা হয়ে যেত।

আর আসত আলেয়া পেতনী। আলেয়া কথাটা শুদ্ধ কথা, ভাল কথা, কলকাতার লোকের কথা, শুনলেই মনে হয় খুব সুন্দরী পেতনী। বেশ সুন্দর করে কবিতা বলে, গান করে। কিন্তু তা নয়। আমাদের দেশে ওদের বলে পেত্যা পেতনী। ওরা রাস্তায় প্রান্তরে আলোর মত দপদপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে গিয়ে, আবার জ্বলে, আবার নিভে নিভে, ছুটে-ছুটে বেড়ায়। এরা হল গায়ে আগুন লাগিয়ে বা কোনক্রমে আগুনে পুড়ে মরা মেয়ে ভূত। এদের গায়ের রঙ ফ্যাকফ্যাকে লালচে শাদা। চুল নেই ভুরু নেই। শুধু চোখ দুটো ওই লালচে শাদা রঙের মধ্যে জুগ্‌জুগ্ করে। চোখোচোখি হলেই এর উপর সাদা দাঁত মেলে হাসে। সে-দেখলে যেমনই সাহসী লোক হোক মূর্ছা যায়।

এই সব রাজ্যের ভূতের কথা মনে করছিলাম।

রামাই ভূতেদের বাড়িটার একটা অংশ এখন আমাদের, বাড়িটার সেই অংশের উঠানেই সেই নিম গাছটা যেটা রামাই অধ্যুষিত বৃহৎ মহাভৌতিক নিম্ববৃক্ষ। আমি সেই গাছটার দিকে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিলাম। মধ্যে মধ্যে বলছিলাম মনে মনে, রামাই প্রভু, রামাই মহারাজ, যদি ভূত হয়ে বেঁচে থাক, তবে সাড়া দাও। তোমার কীর্তির কথা আমাকে বল, আমি তোমাকে অমর করে দেব। হে রামাই মহারাজ, হে ভূতপ্রবর, হে মহাভাগ।

* * * *

এ সব হল অনেক কালের কথা।

এতকালে এরা হয় তো মরে গিয়ে থাকবে।

কথাটা মনে হতেই মনই বললে, কি বলছ? মানুষ মরে মরে ভূত হয়। ভূত আবার মরে না কি?

মরে বই কি। না হ'লে যায় কোথায়?

মরেই বা যাবে কোথায়?

ভাবনা হল—তাইত। মরেই বা যায় কোথায়?

তা হলে?

রামাই-টামাই সব মিথ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা কি সাড়া উঠল। নিম গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে যেন

ফিস্‌ফাস্‌ উঠল। মনে হল বলছে যেন—সর্বনাশ। সর্বনাশ। বলতে নেই বলতে নেই। শালপুকুরের তাল গাছগুলোর মাথায় তালপাতাগুলো খড়মড় খড়মড় শব্দ করে দুলে উঠল, বললে, খবরদার খবরদার। আঁতুর গড়ের পাড়ের উপর তিনটে ন্যাওড়া গাছের মধ্য থেকে কারা যেন বললে, রঁক্কে কঁর মাঁ, রঁক্কে কর।

হ্যাঁ। রক্কে করই বটে। রামাইকে নয় চোখে দেখি নি আমি। কিন্তু পাগলা রাখ-হরির মা, মুখুজ্জে গিন্নীঠাকরুন ভূতকে তো আমি দেখেছি। দেখেছি মানে তাঁর ভূত-জীবনের কাজকর্ম কীর্তিকলাপ আমি দেখেছি।

বাপ্‌! গোটা পাড়াময় ইটপাটকেল, কাঁকর ঢেলা, এ মুঠো-মুঠো বর্ষণ হতে দেখেছি। আরে মশায়, আমার বাড়িতে উঠোনে চালে ছাদে একেবারে যেন ঝাঁকেঝাঁকে বর্ষণ হত।

আশ্চর্য ব্যাপার!

জীবনকালে—কি ভাল মানুষই না ছিলেন মুখুজ্জেগিন্নী। আমার তখন ছেলেমানুষ বয়সের কাল। যেমন সুন্দর ছিলেন দেখতে তেমনি মিষ্টিমধুর ছিলেন ব্যবহারে। সোনার মত ছিল গায়ের রঙ, তেমনি মুখ চোখ, সেই সঙ্গে তেমনি মিষ্টি ছিল কথাবার্তা। কোমল ছিল হৃদয়। মুখুজ্জেগিন্নীর গানের গলাও ছিল খুব মিষ্টি। গান গাইতেন খুব ভাল। সে-কালের গান সব। আবার নাতি নাতনীর বাসর ঘরে নাচতেনও তিনি। আমি দেখেছি নাচ। আশ্চর্য ব্যাপার, এই মানুষ মরে ভূত হলেন।

স্বামী পুত্র নাতি নাতনী রেখে মারা গেলেন। শ্রাদ্ধটাদ্ধ হয়ে গেল। এর পরই দেখা গেল যে সন্ধ্যের পর থেকেই তাঁদের বাড়ির পাশের যে গলিটা সদর রাস্তা থেকে আমাদের ভিতর-বাড়ি পর্যন্ত এসেছে, এই গলি পথে কেউ গেলেই তার মাথায় যেন কে গাঁট্টা মেরে দেয়।

যেমন তেমন গাঁট্টা নয়, গাঁট্টায় মাথার সে জায়গাটা ফুলে ওঠে। প্রথম-প্রথম লোকে কে? কে? কেরে? বলে চেঁচামেচি করত। তারপর ভয় খেতে শুরু করল। মাস-খানেক পর থেকে গলিতে লোকেদের মাথায় বালি কাঁকর বৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। তারপর আরম্ভ হল পড়শীদের ঘরে কাঁকর ঢেলা ঘুটিং বৃষ্টি। ওই গলিটার দুই পাশে যাদের বাড়ি যাদের সঙ্গে ওই ঠাকরুনটির খুব ভাবসাব ছিল, ভালবাসা ছিল, তাদের বাড়িতে উঠানে চালে, যেন শূন্যলোক থেকে কেউ মুঠোমুঠো ধুলো বালি ছিটুতে আরম্ভ করলে। কেউ বলত মানুষ তো হতে পারে না। আকাশলোক থেকে কেউ—। মানুষের ওপরওয়ালা কেউ। ভাবতে গেলেই ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়। আর সে ঢেলা বৃষ্টির ধরন-ধারণই আলাদা। আশপাশের বাড়িতে ঢেলা বালি ধুলো মুঠোমুঠো কাঁকর যেন বৃষ্টি হতে লাগল। কেবল ওই ঠাকরুনের নিজের বাড়িটি ছাড়া। ওদের বাড়িতে কোন ঢেলা বালি পড়ত না। এ ছাড়া এধনই এ বাড়ি তারপরেই পাশের বাড়িতে তারপরই তার পাশের বাড়িতে। দশভূজ বললে যদি বা বেশি হয়, চতুর্ভুজা অনায়াসে বলা যায়। চারটে হাত না হলে এইভাবে ধুলা বালি বর্ষণ হয়

না এবং শুধু ধুলা বালি নয়—ইটের টুকরো ইটের আধলা এমন কি গোটা খান-ইট পর্যন্ত পড়তে লাগল।

পাড়ার লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—কে ফেলছে ঢেলা? ভূতটা হল কে? সম্প্রতি এই ঠাকরুনটি মারা গেছেন, আর কেউ যায় নি। আর সব বাড়িতে ঢেলা পড়ে, ওদের বাড়িতে পড়ে না কেন? কিন্তু তাঁর মত মানুষ কেন ভূত হবেন? এমন ভাল মানুষ। সকলের বাড়িতে ঢেলা পড়ে তাঁর বাড়িতে পড়ে না। তাঁর বড় পুত্রবধূ একদিন রাত্রে খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতে বললেন, ভূত হয়েছো তো পরের বাড়ি ঢেলা মার কেন? লোকে নিন্দে করে গাল দেয়। তার থেকে নিজের বাড়িতে ফেল। জানান দাও। তা হলে ছেলেরা পিণ্ডি দেবে গতি করবে।

সঙ্গে সঙ্গে দমাস করে সামনেই পড়ল খানইট।

তারপরই খোনা স্বরে না কি বললে, পিণ্ডি দিলে যে দেবে তার ঘাড় মটকাবো। তারপরই দেখা গেল দুটো তাল গাছের মত লম্বা পা, একটা নিজেদের বাড়ির চালের উপর রেখে অন্যটা বাড়িয়ে দিয়েছে লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ে বট গাছের দিকে। লালুকচাঁদা পুকুরটা মজা পুকুর, ওখানে শব সৎকার হয় না, মুখাগ্নি হয়। ওই বট গাছটা নাকি মর্ত্যলোক আর ভূতলোকের মধ্যে প্রথম হল্টিং স্টেশন। কিংবা খেয়া ঘাট।

লোকে বলে এই ঠাকরুনটি ভূত হয়েছিলেন সন্তানের মমতায়। তাঁর বড় ছেলে তাঁর ভারী প্রিয় ছিল এবং সে ছিল যেমন রোজগেরে তেমনি মাতাল। যেখানে সেখানে মদ খেয়ে পড়ে থাকত। মা ভাত কোলে করে বসে থাকতেন, দিনেও থাকতেন রাত্রেও থাকতেন। তারপর দিনের বেলা গ্রীষ্মকালে বেলা দুটো আড়াইটার রোদ্দুরের মধ্যে গামছা মাথায় ছেলের খোঁজে বের হতেন। রাত্রেও রাত্রি দেড়টা-দুটো মানতেন না, লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়তেন। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর ছেলের বয়স পঞ্চাশ, তাঁর নিজের বয়স ছিল পঁয়ষট্টি। এই ছেলেকে রেখে মরে তাঁর স্বস্তি হয় নি। কাজেই মরে তিনি ভূত হয়েছিলেন। ভূত হয়ে পাড়ার একটা গাছে বাসা নিয়েছিলেন। লোকজনদের বাড়িতে ঢেলা মেরে জ্বালাতন করতেন, গভীর রাত্রে তাল গাছের মত লম্বা লম্বা দুখানা পা দুটো ঘরের চালের উপর রেখে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখে খুঁজতেন মাতাল ছেলে কোথায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আর ডাকতেন, ওঁরে রাঁখু, ওঁ বাঁবা রাঁখু। বাঁড়ি আয় বাঁবা বাঁড়ি আঁয়।

তাঁর সেই মাতাল ছেলে বলত, হ্যাঁ রাত্রে কোথাও বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে চেতন করিয়ে হাত ধরে নিয়ে আসে। যেদিন কিছুতে উঠতে না-পারি সেদিন এই তাল গাছের মত লম্বা হয়ে এই বড় দুখানা হাত বের করে আমাকে ছোট ছেলের মত পাঁজাকোলে করে বাড়ি এনে শোবার ঘরে দরজায় ফেলে দেয় দুম করে। কোন কোন দিন দু-তিনটে ভুতুড়ে কিল্ বসিয়ে দেয় গুম্‌গুম্ শব্দে। সে কিল এমন কিল যে তার ব্যথায় পরের দিন আর উঠতে পারি না।

এই মমতাময়ী মা-ভূতটি এক পাষণ্ড ছেলে-ভূতকে উদ্ধার করেছিলেন। সে গল্পটা বলি।

একদিন নাকি তাঁর এই ছেলেটি গ্রামের পূর্বদিকে মাঘী পূর্ণিমার মেলা থেকে অনেক খাবার-টাবার লুচি মিষ্টি সিঙ্গাড়া কচুরি কিনে নিয়ে, তার মানে ওই ভূতঠাকরুনের মাতাল ছেলে রাখহরির ভয়ডর তো এমনিতেই ছিল না, তার উপর মদ খেয়ে মাতাল অবস্থাতে সর্বদাই বুঝতে পারতেন যে তাঁর মা-ভূত তাঁর সঙ্গে আছেন, সুতরাং শীতের দিন রাত্রি একটা-দেড়টার সময় এই খাবারের চ্যাঙারিটা নিয়ে, আপন মনেই বলতে বলতে আসছেন :

গড ইজ্ গুড, মাদার ইজ আরও গুড, মাদার ভূত ইজ তার চেয়েও গুড, মানে বেটার বেস্ট।

এখন আমাদের পাড়া আসবার একটা শর্টকাট্ রাস্তা ছিল। সেটা ভাগাড়ের পাশ দিয়ে চাঁড়াল পাড়ার খানিকটা মাড়িয়ে, একটা বড় অশত্থ গাছতলায় এসে পড়েছিল সদর রাস্তায়। সেখান থেকে একটু আগেই আমাদের এই বাড়ির গলি। এখন এই যে অশত্থ গাছটা—এই গাছটায় এক পাষণ্ড ছেলে-ভূত থাকত। লোকটা ভূত হয়েছিল জীবনকালে মাকে খেতে দিত না বলে। অবিশ্যি গরীবগুর্বো লোক বটে—আর কাজও ছোট কাজ করত বটে। রোজগার সামান্যই ছিল। কিন্তু বুড়ি মাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলেছিল, যা তুই ভিক্ষে করে খেগে যা।

মা না-খেয়েই মরেছিল। কিন্তু ভূত হয় নি। ছেলে এই পাপে ভূত হল। হয়ে এই অশত্থ গাছে থাকল। ওর সাজা হল—ভূত রাজ্যে কোথাও ওর কাজকর্ম জুটবে না এবং কেউ ওকে খেতে দেবে না। অগত্যা লোকটা শুধু ভূত হল না—চোর ভূত হল। কাজ হল, ওই গাছ-তলা দিয়ে যারা খাবার নিয়ে যায় তাদের খাবার কেড়ে নেওয়া, চুরি করে নেওয়া। সেই কারণে এই গাছতলা দিয়ে কেউ যেত না। সেই মাকে-খেতে-না-দেওয়া ছেলে-ভূতটা গাছটার একটা কোটরে উপোস করে প'ড়ে প'ড়ে চিঁচিঁ করত। ওই পাখিতে বা কুকুরে বা বেড়ালে কোন খাদ্য মুখে করে আনলে তাই কেড়ে খেয়ে কোন মতে ভূত জন্মে বেঁচে ছিল।

কেউ না-জেনে গাছতলা দিয়ে খাবার নিয়ে গেলে ভূতটা তার পিছু নিত তারপর ভয় দেখিয়ে খাবার কেড়ে নিত। পাঁচি ঠাকরুন বলে একটি মেয়ে ছিলেন, তিনি ভাত রান্না করতেন পরের বাড়ি ; রাত্রিতে মনিববাড়ি রান্না সেরে দিয়ে বাড়ি আসতেন কিছু খাবার-টাবার নিয়ে। কিন্তু অন্য পথে যেতেন এই ভূতটার ভয়ে। যেদিন তাড়াতাড়ির জন্য এই পথে যেতেন সে দিন ভূতটার সঙ্গে লড়তে হত। ভূতটা প্রায়ই জিতত। সে কেড়ে নিত খাবার। পাঁচি ঠাকরুন গাল দিতে দিতে বাড়ি যেতেন। কোন দিন খানিকটা খাবার রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলতেন, ওই নে আর পাবি নে।

এখন যেদিনের কথা বলছিলাম, সেদিন ওই মা-ভূতের মাতাল মানুষ-ছেলে রাখুবাবু খাবারের চাঙারি নিয়ে ওই পথ ধরেই বাড়ি আসছিল। ওই গাছটার কাছে আসবামাত্র ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠতে লাগল। ভূতটা ওই চ্যাঙারিভর্তি সুখাদ্যগুলির গন্ধ শুঁকছিল।

রাখুবাবু হেঁকে উঠেছিল—কোন হ্যায় ?

ভূত বলেছিল, হঁম হ্যাঁয় রে। হঁম ভূত—হ্যাঁয়। কিঁসের গন্ধ উঠছে ? কিঁ খাঁবার

নিঁয়ে যাঁচ্ছিস ?—রাঁখ খাঁবার ! এঁ গাঁছতঁলা হঁল আঁমার জঁমিদারি। রাঁখ খাঁবার।

রাখহরি হেঁকেছিলেন, খবরদার। মাকে বলে দেব বলছি !

ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে এক ধাক্কা মেরে রাখহরিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসে বলেছিল, এঁইবার।

তার সঙ্গে খোনা খোনা আওয়াজে ভূতুড়ে হাসি—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

রাখহরি চীৎকার করে উঠেছিল—ও-মা-গো, মারলে গো, ও-মা—।

মা তখন আমাদের গলিতে গাছের ডালে বসে রাখহরির জন্যে ছড়া কাটছিল—

আয় রে রাখু ঘর আয়—
বাড়া ভাত তোর জুড়িয়ে যায়।

এরই মধ্যে তাঁর কানে এসে ঢুকল রাখহরির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে 'কেঁ-রেঁ, কেঁরেঁ আমার রাঁখুকে মারে' বলে একগাছা ঝাঁটা নিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ওই অশথ গাছের গোড়ায়, যেখানে মাকে-খেতে-না-দেওয়া ভূতটা রাখহরিকে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে দুপাটি মূলোর মত দাঁত মেলে ইঁ ইঁ—শব্দ করে ভয় দেখাচ্ছিল—এবং কামড়াবার যোগাড় করছিল।

মা-ভূত সেখানে ঝপ করে লাফ দিয়ে নেমেই ওই মাকে-খেতে-না-দেওয়া ভূতটাকে ঝাঁটা দিয়ে দে মার ! মার তো মার, উথালি পাতালি মার !

আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছিল নাকি !

ঝাঁটার বাড়ি খেতে খেতে ওই পাপিষ্ঠ, মাকে-খেতে-না-দেওয়া ভূতটা ফুটবলের ব্লাডারের মত চুপ্‌সে গিয়েছিল। এবং একটি আত্মা তার থেকে বেরিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল, মাকে খেতে না দিয়ে যে পাপ করেছিলাম, সে পাপ আমার, তোমার মত মা যে ছেলের জন্যে ভূত হয়ে রয়েছে এবং ছেলেকে আগলাচ্ছে, তার হাতের ঝাঁটা খেয়ে আমার পাপমোক্ষণ হয়ে গেল। আমি আজ ভূতজন্ম থেকে খালাস পেলাম। বলেই সে একটা জোনাকি পোকার মত দীপ্যমান হয়ে চলে গেল।

এরপর রাখহরি মারা গেল।

রাখহরি মারা যাবার দিন খুব ঝড় হয়েছিল। লোকে বলে ওই মা-ভূত সেদিন ছেলেকেও ভূত করে নিয়ে চলে গিয়েছিল, ভূতেদের কোন রাজ্যে, সেখানে রাখহরি কণ্ট্রাক্টারী কাজ পেয়েছিল। তদবধি মা-ভূতেরও কোন পাত্তা নেই।

তা হলে ?

কোথায় পাব ভূতের পাত্তা ? কি করে আরম্ভ করব আমার গবেষণা ?

হঠাৎ মনে হল মকবর ঢিবিতে গেলে তো হয় !

চার

শ্যামাপদ মোদকের বাড়ির ওধারেই মকবর ঢিবি; এস্থানটি একদা মামদোভূতের জন্ত বিখ্যাত ছিল। হিন্দুপাড়ার পর একটা রাস্তা; রাস্তার ওপারে মস্ত একটা প্রান্তর; তারপর মুসলমানপাড়া। ওই প্রান্তরে একটা ঢিবি, তার উপর একটা আম গাছ, সেই আম গাছ-তলায় একটি ফকিরের সমাধি এবং এই সমাধিকে ঘিরে অসংখ্য সমাধি। এই হল মকবর ঢিবি। মকবর ঢিবি মুসলমানদের বহুকালের কবরস্থান; সেই কোন কালে রুমের বাদশা হারুন-অল-রশিদের সময় এক ফকির এসে এখানে পাড়ার পত্তন করেছিলেন। তাঁর দরগাকে ঘিরে কত হাজার কবর যে হয়েছে আজ পর্যন্ত তার হিসেব কে বলবে? কিন্তু এককালে সকলেই বলত অমাবস্যা, চতুর্দশী, বিশেষ শুক্রবারে মামদোভূতেরা উঠে চেল্লাচিল্লি করত। চেল্লাচিল্লি চরমে উঠলে হজরত সাহেব আসতেন। এই মেহেদি রঙানো দাড়ি গোঁফ নখ, এই আলখাল্লা, এই পাগড়ি, পায়ে নাগরা—এসেই বলতেন, যাও সব কবরে ঢুকে যাও। অমনি সব কবরে ঢুকে যেতো। হজরত সাহেব কদমা খেতে ভালবাসতেন। লোকে তাঁকে কদমার শিরনি দিত। কদমার শিরনি দিলে কোন মামদো তার কোন অনিষ্ট করত না। হজরত সাহেবের নামই হয়ে গিছল কদমা সাহেব। কদমা সাহেব নাকি খুব বড়দরের উলেমা ছিলেন। জীবিতকালে গোটা কোরান শরিফ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর আমলে তিনি সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুদের পূজা-টুজার সময় কদমা সাহেব চেকলুঙি আর মোট তাঁতের কাপড়ের হাফ পাঞ্জাবি পরে মাথায় টুপি লাগিয়ে ডান হাতে তাঁর সিদ্ধছড়ি (বাঁশের লাঠি) নিয়ে বাঁ হাতে তাঁর হুঁকোটি ধ'রে টানতে টানতে এসে হাজির হতেন, হাঁকতেন, কাকা রইছেন নাকি? অথবা, বাপজান কোথায় গেল্যা গ?

ধুমধাম পড়ে যেত—আন আন মিঠাই আন। কদমা আন—ফলফুলুরি কি আছে, আন। হজরত সায়েব এসেছেন। তামাক সাজ তামাক সাজ। ওই যে কাষ্টগড়ার তামাক—ওইটে সেজে খান।

উঁ-হু। কদমা সাহেব বলতেন—কাষ্টগড়া-ফড়া নয় বাপু; গাঁয়ের মনিষ্যি, চাষাভূষার ঘরের ছাওয়াল, ও তামাক গলায় সুড়সুড়ি দিবে হে। দা-কাটা আন। হ্যাঁ। খ্যাক কর্যা গলায় লাগবে। সরদ্ উঠে যাবে। আর তোমাদের পণ্ডিত জনে ডাক।

পণ্ডিত বিশেষ করে ওই যে বৈষ্ণব পণ্ডিত, ওর সঙ্গে ছিল যত ভাব তত ঝগড়া। দেখা হলেই আরম্ভ করতেন, মুছ হে বৈরিগী পণ্ডিত ফোঁটা তিলক মুছ।

পণ্ডিত বলত, কেন? তুমি যে নিজে ঠ্যাঁটা হে।

মুছবে এই জন্যে হে, যে তুমি ঠ্যাঁটা তুমি চোরা। একদিকে ফোঁটা কাটো মালা জপ কর আর অন্যদিকে যত সব মামলার তদ্বির কর। তুমি যার পূজা কর হে, সে ছোকরাটি যে মস্ত ঠ্যাঁটা হে। তোমাদের কিষ্ট। ওই কুরুপাণ্ডবে লড়াই বাধাইয়া বাস, শ্যাষ করে দিল সব। আবার বিন্দা-বনে রাধা কন্যেটির সঙ্গে মহব্বতি করে পালায়ে এসে রাজা হইল, বিয়া করব

ষোল হাজার। ক্যানে হে? এমন জালিয়াতি বুদ্ধি ধরে ক্যানে হে! রাধাবেটীটি, আহা বলে পদ্মের মধ্যে জন্ম হইছিল। আর তেমনি রূপ। আহা তারে কি কষ্টটাই না দিল! তেমনি কি যশোদা মায়েরে দুঃখ দিল ছাওয়ালটা! পাষাণ হে পাষাণ!

কীর্তন গান শুনতে আসতেন। আসরে বসতেন না। একটু দূরে আড়াল দিয়ে বসে শুনতেন। যেন অন্য মোল্লারা কেউ কিছু বলতে না-পারে। আর কাঁদতেন।

এই হজরতকে এইখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। হজরত সাহেব কদমা ভোগ পেতেন, আগরবাতি জ্বেলে দিত লোকে। বাতি দিত তার সঙ্গে। হজরত সাহেব পরম আনন্দে এখানে বাস করতেন। এখানে মামদোভূত, সে তো কম ছিল না, হাজার দরুনে ছিল। তার কারণ মামদোদের সব সেই শেষ বিচারের দিনের অপেক্ষায় মামদো হয়ে থাকতে হয়। এই হাজার হাজার ভূতের হজরত হয়ে বাস করতেন। লম্বা সাদা দাড়ি গোঁফ, সাদা এই পুরু বাবরি চুল; এক হাতে হুঁকো অন্য হাতে লাঠি, পায়ে খড়ম পরে গোটা গ্রাম ঘুরতেন। হিন্দু মুসলমান দুই পাড়াই ঘুরতেন। বাইরে থেকে কোন বদমাশ ভূত চোর ভূত কি ঠ্যাটা ভূত যদি গ্রামে ঢুকত তাহলে তাঁর সেপাইদের হুকুম দিতেন, ধঁর বেঁটাকে ধরে বেঁটাকে পিটে চামচিকে ক'রে ছেড়ে দে। মামদোরা নবাগত ভূতকে ধরে মাটিতে ফেলে কিল মেরে (ভূতদের বায়বীয়দেহ) সব বাতাস বের করে চ্যাপটা করে চামচিকে বানিয়ে ছেড়ে দিত। চামচিকেটা বনেবাদাড়ে ঘরের কোণে ফুর ফুর করে উড়ে বেড়াত আর এঁটো কাঁটা খেত।

মধ্যে মধ্যে, বিশেষ করে (সেকালে অবশ্য) হিন্দুদের পর্বের সময় পুজোর শেষে কদমা সাহেব এসে ঢুকতেন হিন্দু পাড়ায়। ডাঁক হে তোঁমাদের সেই ঠ্যাটা বৈরাগী পণ্ডিতকে ডাঁক হে। জবাব দিক তো দেখি দুর্গা মাইয়াটার মত এমন সোনার প্রতিমে কন্যাটারে—শিঁবের মঁত বুড়া ভাঁঙড়ের সাঁতে সাঁদী দিল ক্যাঁন? যত সব মামদোভূত সেদিন সিদ্ধির নেশা করে গান ধরত—'কি ঠাউর দেখলাম চাচা'!

শোনা যায় প্রতিমা বিসর্জনের পর কেঁদে সারা হতেন কদমা সাহেব এবং গাল পাড়তেন বৈরিগী পণ্ডিতকে। বলতেন, তোরা করেছিস ইসব। তোরা পেতে দিয়েছিস। মধ্যে মধ্যে তর্ক বাধত, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াটা বেশি তেজী না দুলদুল ঘোড়াটা বেশি তেজী তাই নিয়ে। এ সব তকরার সেকালে অনেক লোকে কানে শুনেছে। চোখে কিছু যেত না কিন্তু মকবর ঢিবির আশে-পাশে দাঁড়ালে শোনা যেত—কদমা সাহেব বলছেন—ওঁরে কুঁচক্রী বোঁরেগী পঁণ্ডিত! ব্যাঁটা তোঁর নিকুচি কঁরব আঁজ! তোঁর ওই কদুর বোঁটার মত চৈঁতনাটা টেঁগ্যা ছিঁড়ে লিঁব আঁজ!

মকবর ঢিবিতে মাঝে মাঝে অন্য মামদোদের সাড়া মিলত। ইশাক্ শেখের ফুফুতে আর মায়ে কাজিয়া লাগত। ওদের দুজনকে পাশাপাশি এবং খুব কাছাকাছি কবর দেওয়া হয়েছিল। এ দিকে পাশ ফিরতে এর হাতখানা ওর গায়ে লাগত ও দিকে পাশ ফিরলে ওর হাতখানা এর ঠিক মাথায় এসে লাগত। এর অর্থাৎ চাচী আয়েষার চুল ছিল এক মাথা আর খুব লম্বা, খুব বাহারের খোঁপা বাঁধত সে; ওর অর্থাৎ ফুফীর চুল ছিল না একদম। পাড়ার

লোকে তাকে নেড়ী দেলেরা বলে ডাকত। কেউ কেউ বলত নাকু নেড়ী। মানে নাকটা ছিল খুব বড়। পরস্পরের গায়ে হাত ঠেকলেই ঝগড়া শুরু হত। ও অর্থাৎ আয়েষা ধরত নাকু নেড়ীর নাকে আর নাকু নেড়ী দুই হাতে মুঠো বেঁধে ধরত আয়েষার চুল। কবর থেকে বেরিয়ে পড়ত বিকট শব্দ করে।

এঁা—ও।

অঁ—ও।

এঁ্যা—ও অঁও।

তারপর, খঁ খঁ খঁ খঁ খঁ।

দুটো মিশ কালো কিছু, দুটো কালো বেড়ালের মত ছেঁড়া-ছিঁড়ি কামড়া-কামড়ি করত। কদমা সাহেবের মৌজ ভেঙে যেত। কদমা সাহেব আপিং খেতেন। সেই আপিংয়ের মৌজ ছুটে গেলেই রাগে ক্ষ্যাপা হয়ে যেতেন। কদমা সাহেব হাতের ডাণ্ডাটা মাটির ওপর ঠুকে ইশাকের চাচাকে ডাকতেন, ধরে আন দুটাকে।

দুটো মেয়েই এরপর মাথার উপর বোরখা চাপিয়ে সামনে আসত। এবং বোরখার মধ্য থেকে এক হাত জিভ কেটে হাত জোড় করে এসে দাঁড়াত আর কাঁদত। এ কেঁদে বলত, আমার সব চুল ছিঁড়ে নিলে। ও বলত, আমার নাক কামড়ে কি করেছে দেখেন হজরত।

মকবর ঢিবির চারিপাশে ক'টা তাল গাছ আছে। ওই তাল গাছে তাড়ি দেয় হাজামদের তিনু হাজাম। তিনু হাজামের বাবা-দাদাও গাছগুলোয় তাড়ি দিত। তাড়ির সময় সন্ধ্যে-বেলা হলেই তাড়ির হাঁড়ির মুখে ফেনা জমে উঠলেই যত মামদো—কবর থেকে বেরিয়ে তাড়ি খেয়ে সন্ধ্যের সময় ঢেল ডিগ্ ডিগ্, মানে হাডু ডুডু, খেলত। কখনও আলকাটার কাপের গান জুড়ত। চেল্লাচিল্লির শেষ থাকত না। হজরত সাহেব হুঁকাটা হাতে এসে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বলতেন, চুঁপ বিধরমী সব, চুপ।

এখন শুনলাম, গোটা মকবর ঢিবিতে কদমা সাহেবের কোন সন্ধান মেলে না। তার সঙ্গে সঙ্গে মামদোদেরও পাত্তা নেই।

গেল কোথায়? গুজব শুনলাম, দেশভাগ হওয়ার সময় তারা সব পূর্বপাকিস্তানে চলে গেছে। কদমা সাহেবও গেছেন। তবে, পূর্বপাকিস্তানে যান নি। কেউ বলে, তিনি মক্কাশরিফ গেছেন; কেউ বলে, না, তিনি এখানকার বড় মসজিদের সামনের উঠানটার এক কোণে কবর খুঁড়ে নিয়ে সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। কোন সাড়া কাউকে দেন না।

শুনলাম, মামদোদের জায়গায় নাকি গোটা পূর্বপাকিস্তান থেকে লাখে লাখে রেফুজী ভূত এসেছে। তারা এ-অঞ্চলে বড় কেউ আসেনি। চব্বিশপরগনা নদীয়া মুরশিদাবাদ এবং উত্তর-বঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলির গাছ-গাছড়ার মাথায় ডালেডালে তারা আশ্রয় নিয়েছে।

একজন ওঝার কাছে শুনলাম তাদের ভয়ানক বিক্রম। তারা সীমান্ত অঞ্চলের বনবাদাড় তাল গাছের মাথা, বট গাছের ডাল, বেল শ্যাওড়া শিমুল গাছগুলোর ডালপালা চমৎকারভাবে

কাটাই-ছাঁটাই করে একেবারে ভূতের হাট বসিয়ে দিয়েছে।

* * *

যাক গে। শোনা কথাতে আমার দরকার নেই। সবাই বলে এমন সব কথা যা শুনে মনে হবে লোকটার কথা তার নিজের কথা, নিজের চোখে দেখেছে এসব। কিন্তু জেরা করলেই বলে, আমি শুনেছি।

কাজেই আমি নিজে রিসার্চে রত হলাম। চার রাত্রি পরপর জেগে রইলাম। ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। ভাগ্যক্রমে অমাবস্যার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছিলাম। একাদশী ছিল সেদিন। পাঁজিতে সেদিন ছিল রাত্রি দশটার পর মৃতে ত্রিপাদ দোষ অর্থাৎ পুস্করা প্রাপ্তি। পরদিন সন্ধ্যা থেকেই অগ্নিকোণে ছিল যোগিনী তার সঙ্গে কালরাত্রি ঘাতচন্দ্র, মৃতে দ্বিপাদ দোষ। তারপর দিন ছিল চতুর্দশীতে ভূত-লগ্ন। তারপর দিন তো সাক্ষাৎ অমাবস্যা। এই অমাবস্যায় ভূতদের সেনাবিভাগ থেকে মানুষদের উপর কার্ফু জারি করা হয়ে থাকে। এ দিন রাত্রে ভূতেরা হুমহাম করতে করতে বের হয়। ভয় পেয়ে কেউ গাছে উঠলে পিছন থেকে খোনা সুরে কে যেন হেসে ওঠে—হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ। তখন মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে যায়, 'ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে; ভূতেরা পেলে হাতের কাছে।' এরপর মুট করে ঘাড়টি ভেঙে চোঁ করে রক্ত খেয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। এ কয়েকটা রাত্রিই আমি জেগেই রইলাম।

প্রথম রাত্রি রামাইদের সেই বিখ্যাত নিম গাছটার বাচ্চা নিম গাছের ঠিক সামনে।

দ্বিতীয় রাত্রি গেলাম শাহীপুকুরের পাড়ে যেখানে সেই বিরাট শিমুল গাছটি ছিল। যে গাছের কোটরে কোটরে থাকত চারটে পেতনী, গাছটার গোড়ায় থাকত গোটা কয়েক গোদানা। চারটে মূল ডালে থাকত আটটা গোলাম ভূত। আর যার মাথাটা ছিল এ অঞ্চলের ভূতদের টাউন হল; সেই শিমুল গাছের তলায় কাটালাম। গাছটার তলায় গোটা গ্রামের অশৌচের হাঁড়ি ফেলা হত। ভূতেদের সে এক বিরাট জমায়েৎ হওয়ার স্থান। এ গাছটাও নেই। তবু জায়গাটা আছে। আশেপাশে মানে শাহীপুকুরের চারিপাশে আরও তিনটে পুকুর আছে—বারিপুকুর, কালী সাগর, কাশীর পুকুর। সেখানেও অনেক গাছ আছে। ভূতেদের পক্ষে বেশ মনোরম থাকবার জায়গা। কাশীর পুকুরে কয়েকটা ভূত ছিল আর পেতনী ছিল, তারা বাঁশঝাড়ে থাকত। লোকজন গেলেই বাঁশেদের সঙ্গে নিজে বাঁশ হয়ে দিব্যি মরা বাঁশের মত রাস্তায় পড়ে থাকত। লোকে যেই সেটাকে পার হতে যেত অমনি বাঁশটা উঠে যেতো তড়াক করে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হুই আকাশে উঠে গিয়ে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে মরত। এখানে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম সারাটা রাত। খুট শব্দ হলেই কান খাড়া করেছি, টর্চ ফেলেছি, আর টর্চ না ফেলেও দেখেছি।

তৃতীয় হল লালুকচাঁদার বটগাছ।

ফনা পেতনী একটা ডালে দাঁড়িয়ে আর একটা দুই হাতে ধরে:

হেঁইয়ো হেঁইয়ো হেঁইয়ো। মরি মরি মরি।

দোঁলন খেঁয়ে আঁশ মেঁটেনা।

আঁশ মেটেনা গোঁ-ও-ও।—বট বৃক্ষে চড়ি। মরি মরি মরি।

ফনা পেতনী নাচত চমৎকার, গাইতও চমৎকার; মধ্যে মধ্যে নাকি ভূতেদের জলসায় ও নাচগান করত। এই ফনা পেতনীর আস্তানা লালুকচাঁদার পাড়ের বটবৃক্ষতলায় একরাত্রি কাটালাম, কিন্তু তাই-ই বা কোথায় কি?

এই বট গাছটাও এখন নাই, গ্রাম বেড়েছে, পুকুরটার চার পাড়ের উপর বসতি হয়েছে। আজকাল মুখাগ্নিও এখানে হয় না, গঙ্গা নিয়ে যাবার জন্যে এখানে মড়া গাছের ডালে বেঁধেও রাখে না। এখানে এখন ডোমরা বাস করছে। এখানকার ডোমরা বিখ্যাত চোরও বটে। আমি অনেক গল্প লিখেছি ওদের নিয়ে। ডোমদের জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে তোরা কোনও খবর রাখিস ফনা পেতনীর? তোরা তো রাতও জাগিস। বলতো খবর।

ওদের মধ্যে প্রধান এখন সর্‌লার মা। আশির উপর বয়স। সে বললে, সে সব কোথায় পাবা বাবা? খবর কে দেবে? সারা রাত্তিরের মধ্যেও এত কালে কোন ভূত পেতনীর সাড়া পাই না। তবে হ্যাঁ। সে কালে ছিল; তা শুনেছি। তুমি বাবা বরং লাঘাটা নদীর বিরিজের হোথা গিয়ে দেখ; শড়কের ওপর সে-কালে আলেয়া ভূত, নাম তার 'রসি-পেত্যা', সারা অঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে বেড়াতো। ওই গোগার বড়তলার বায়েন পাড়া থেকে ছুটতে ছুটতে যেত নদীর ধার পর্যন্ত। তারপরে নদী পার হতে না পেরে নদীর ধারে ধারে জ্বলে মলাম বলে চেঁচাতো। এই গায়ের চামড়া—ওটা রাঙা সাদা মেশানো গায়ের রঙ, সর্বাঙ্গের কোথাও চুলের 'চেহ্ন' নাই। তার কথা তো মনে আছে। নদীর ধারে রেলের পুলের গোড়ায় গিয়ে দেখতে পার। তার ওদিকেই গাঁয়ের শ্মশান, শুধু এ গাঁয়ের কেন দশখানা গাঁয়ের। ওখানে দেখতে পার।

রসি পেত্যা, রাসমনি বায়েন কন্যে, গায়ের কাপড়ে আগুন লেগে পুড়ে মরে পেত্যা হয়েছিল। পেত্যা মানে আলেয়া। বায়েন পাড়া থেকে রসি পেত্যা জ্বলতে জ্বলতে নিভতে নিভতে যেত নদীর ধার পর্যন্ত। নদীর ধারে ধারে পেত্যাদের অর্থাৎ আলেয়াদের রাত দুপুরের মজলিস বসত। মানুষদের যেমন দুপুরবেলা মেয়েদের মজলিস বসে, গল্পগুজব পরনিন্দা তাস খেলা কড়ি খেলা চলে; তাই হত ওদের রাত দুপুরের মজলিসে। পেত্যাও এখানে কম ছিল না। এগাঁ ওগাঁ সেগাঁ মানে চারপাশের দশবারো খানা গ্রাম থেকে জন দশেক পেত্যা আসত। এদের সবই হল মেয়ে। ওই চামড়া-ওঠা 'ফ্যাকফেকে' অর্থাৎ 'দগ্‌দগে' লাল সাদা সে এক বীভৎস গায়ের রঙ, রাত্রির অন্ধকারে ওই রঙের সর্বাঙ্গ থেকে দপ্‌দপ্‌ করে আগুন বের হয়। ওরা নদীর ধারের একটা পতিত জায়গায় জবজবে জলার মধ্যে ওদের আসর ফেলতো। গায়ের জ্বালায় ওরা জবজবে জলায় গড়াগড়ি খেতো।

* * *

সেখানেও রাত্রি কাটালাম। এখন সেখানেও আর তেমন ঠাঁইটি নাই। বসতও অনেক হয়েছে। পুলের মাথায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। বেশ খানিকটা রাত্রি পর্যন্ত সাঁওতাল বসতিতে মাদল বাজে গান বাজনা হয়। ছোটখাটো একটা কারখানা মতও হয়েছে।

ভোরবেলা না-হতে সেখানেও ভোঁ বাজে। রাত্রি দুপুরে, অমাবস্যার ঘুরঘুটি অন্ধকারে সেখানে জেগে বসে থাকলাম। কিন্তু কোথায় কি? কতকগুলো জোনাকিপোকা দিপ দিপ্ করে জ্বলা ছাড়া আর কোন হদিস পেলাম না। গোটা দুই-তিন জোনাকিপোকা ঝটকা দিয়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে দলে দিলাম। দেখলাম পোকাটা পোকাই বটে, ভূতটুত নয়। ফসফরাসের একটা করে লম্বা দাগ কিছুক্ষণ মাটির উপর কালির আঁচড়ের মত জেগে রইল। তারপর উপে গেল।

তা হলে?

এরা গেল কোথায়?

না, সবই মিথ্যে?

পাঁচ

অমাবস্যার পরদিন; সে প্রায় হতাশ হয়ে ভাবছি। হাতে যম দত্তর ছকে দেওয়া একখানা ফর্ম। দত্তের নির্দেশ—বৈজ্ঞানিক পন্থায় অনুসন্ধান চালাতে হবে। দত্তের ছকে দেওয়া ফর্মের দিকে তাকিয়ে দেখছি, এক নম্বর প্রশ্ন হল :—ভূতের নাম। এবং মনুষ্যজীবনে যে নাম, ভূত-জীবনেও সেই একই নাম কিনা! ভূত কি রকম ভূত? অর্থাৎ ভূতের পেটের জন্মানো ভূত কিনা? না, মানুষ মরে ভূত হয়ে সরাসরি ভূতলোকে ঝপাং করে পড়তে পড়তে কোন গাছের ডাল ধরে ডালে চড়েছে কি না?

বর্তমানে বাসস্থান কোথায়? মানুষের এই বসতির মধ্যে আসার কারণটি কি? বাসস্থানটির অল্প বর্ণনা। কোন পতিত বাড়ি বা কোন গাছ বা কোন জলা বা কোন শ্মশান—যাই হোক তার বিবরণ। তারপর হল ভূতটি দেখতে কেমন? পা কটি? হাত কটি? দাঁতগুলি কেমন? পায়ের পাতা সোজা পড়ে, না উল্টো পড়ে।

সপ্তশতী চণ্ডীতে আছে—দেবী যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীতে অনেক ভূত ছিল। তাদের কারুর ছিল একটা পা, কারুর তিনটি পা বা আরও বেশি। কারুর একটা হাত, কারুর দুটো, কারুর চারটে-পাঁচটা, নখগুলো নরুনের মত। কারুর তিনটে চোখ, কারুর বা একটা, কপালের ঠিক মাঝখানে। গল্পে আছে, দাঁত হয় মূলোর মতন কান হয় কুলোর মতন। হাতি ঘোড়া উট চিবিয়ে খায় সে দাঁতে। আর ধিন তাক তাক করে নাচে।

ভারতচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ বর্ণনায় লিখেছেন—

"চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁকিনী পেত্নিনী মুক্ত কেশে।"

দক্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে তারা যা করেছিল সে তো ভয়ংকর কাণ্ড।

"মার মার ঘের ঘার হান-হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ—আশপাশ কাঁপিছে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম থুম থাম—ভীমশব্দ ভাসিছে।"

এ তো না হয় যুদ্ধের ব্যাপার। বিয়ের ব্যাপারেও তারা—"ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ—লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চলে।" "করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া—হাসে হি-হি হি-হি হি-হি।"

সব একেবারে ফক্কিবাজি, ফাঁকি হয়ে গেল। আরব্য উপন্যাসে আছে দস্যুদের গুহায় কতকালের সঞ্চয় করা ধন ঘড়ায় ঘড়ায় সিন্দুকে সিন্দুকে মজুত ছিল। ভূতের কথা ভূতেদের ব্যাপারও ঠিক যেন তাই। মানুষের মনের গুহায় নতুন নতুন ভূতের কথা মজুত হত। সেই রাজত্বে কোথা থেকে এল হাল-আমলের কোন এক কাঠুরে আলিবাবা; এসে চিচিংফাঁক মন্ত্রটি শিখে নিয়ে বাস্ ছালায় ছালায় বয়ে বয়ে নিয়ে সব ফাঁক করে দিলে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারলাম না।

ভূত মিথ্যে হয়ে গেল, এ কি কম দুঃখের কথা? হায় হায় হায়!

যে বাড়িটায় বসেছিলাম সেই বাড়িটার পূর্বদিকে একটা বড় পুকুর; পুকুরটার ওপারে লেখাপড়া না-জানা খেটে-খাওয়া মানুষদের পাড়া; আগের কালে সে সব পাড়ায় ডাল পড়লে ঢেঁকি হতো, পাতা পড়লে কুলো হতো; মানুষদের বিশেষ করে প্রবীণা বুড়ীদের অহরহ মন যেন কাঁদি-কাঁদি করত; ছুতোয় নাতায় তারা কাঁদতে বসত। বেশ সুর করে উঁচু গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতো। কত কাল আগে মরা বাপ বা ভাই বা যে হোক কাউকে স্মরণ করে কাঁদত, ওরে বাবারে, কি দাদারে, কি ভাইরে, কোথা গেলি রে! একবার আয় এসে আমার দশা দেখে যা রে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠানের কি রাস্তার ধারে গাছটার ডালপালা দুলে উঠত। বুড়ীও কান্না থামাতো, কারণ বুঝতে পারত, দাদা ভূত কি বাবা ভূত এসেছে। এবং বসে ডাল দুলিয়ে সাড়া দিচ্ছে।

আজও যেন কেউ কাঁদছে। সম্ভবতঃ মরা বাপ-দাদাদের জন্যে কাঁদছে না। কাঁদছে ওই সব ভূতদের জন্যে।

ওরে ভূতেরা রে, ভাইরে বাবারে মারে, তোরাও শেষে মরে গেলি রে। জন্ম ম'ল জন্মান্তর ম'ল এপার ম'ল ওপার ম'ল। সোনার ভূতরাজ্যি এমনিই করে ছারখার খান খান করে দিলে রে। আঃ হায় হায় হায়। সোনার রাজ্য বরবাদ হয়ে গেল। পরলোকের পথে যেখানে পথটা দুমুখো হয়ে দুদিকে চলে গেছে, একদিকে স্বর্গ একদিকে নরক—সেই-খানে দাঁড়িয়ে আর কোন দিকে কিছু নেই। অথচ এই পথটাই ছিল হেড আপিস, রাজধানী বলতে পার। এখান থেকে ভূতেরা ফিরত এই মর্ত্যের দিকে, সেই চেনা মর্ত্য। যেখানে অসংখ্য গাছ, বেশ ভাল ভাল গাছ, পুরনো পুরনো বাড়ি, নানান জলা, নানান শ্মশান।

হেড আপিস সমেত সেই রাজ্যটাই একেবারে নো পাত্তা। সন্ধান নেই হদিস নেই। এখন তা হলে মানুষদের কি হবে ?

মরার পর তারা স্বর্গেও যাবে না নরকেও যাবে না ভূতও হবে না ; ফুটবলের ব্লাডার ফুটো হয়ে ফুস করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে যাবার মত, কিম্বা বেলুন ফেটে বাতাসের মত প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যাবে। হৃদপিণ্ড মানে হার্টটি ধুক্ ধুক্ করতে করতে ঠুক্ করে থেমে যাবে ?

হে ভগবান।

এ হল কি বল তো ? ভূতহীন সংসারে মানুষ বাঁচবে কি করে ? ভগবানহীন সংসারে মানুষ জয়ধ্বজা উড়িয়ে ফেরে কিন্তু ভূতহীন সংসারে মানুষ জয়ধ্বজাটা ওড়াবে কার কাছে ? মানুষ মরেই বা হবে কি ? কোথায় যাবে ? হায় হায় হায় হায়। দুপুরবেলা আর ঢেলা পড়বে না, তিনসন্ধ্যাবেলা গা ছমছম করবে না, রাত্রিকালে খোনা সুরে কেউ গান গাইবে না। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে না। অন্ধকার রাত্রে ছায়ামূর্তিরা দলবেঁধে বা একাএকা লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ভ্রমণ করবে না। তা হলে সংসারেই বা থাকল কি, জীবনেরই বা ভবিষ্যৎ কি ?

সামনে সেই রামাই ভূতের সুখের 'বালাখানা' অর্থাৎ বসত। সেই প্রকাণ্ড নিম গাছটার ছানা নিম গাছটা সন্ সন্ শব্দ করে বাতাসের দোলায় দুলতে দুলতে কিছু বলছিল। মধ্যে মধ্যে নিমের ফল খসে খসে পড়ছিল টুপ্ টুপ্ করে।

ঠিক এমনি সময়ে টেলিগ্রাম। বলে বাড়ি ঢুকল আমাদের পোস্টাপিসের টেলিগ্রাফ্-পিওন।

টেলিগ্রাম ? কে টেলিগ্রাম করলে ? বিরক্ত করে দেবে এরা। কি অন্যায়ই করেছি এই সাহিত্যিক হয়ে। নবেল নাটক গল্প ছড়াপাঁচালী লিখে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানুষেরা প্রায় ক্ষেপে উঠেছে সভা মজলিস জলসা নাট্যাভিনয় নৃত্যনাট্য নিয়ে। দাপাদাপির বিরাম নেই। কলকাতার রবীন্দ্র সদন থেকে শুরু করে লাভপুর যে লাভপুর—তার আশপাশের গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত। গ্রামের লোকেরাও দুটো-তিনটে করে সভা করে চলেছে। এতে প্রয়োজন সভাপতিত্ব করবার জন্য এক-একজন নিরীহ সাহিত্যিকের। যাদের পয়সা কড়ি দিতে হবে না, জল খেতে দিলেও হবে, না-দিলেও হবে এবং দিলেও তিনি খাবেন না। যাবার সময় হেঁটে বাড়ি যাবেন। নেবেন একটি ফুলের মালা আর দেবেন একটি বক্তৃতা। আর বসে থাকবেন সারাক্ষণ সেই আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত। বলতে ভুলেছি এখানে আসা অবধি এদের আর হামলার শেষ নেই। সকালে দুদল আসে তো বিকেলে চার দল আসে, যেতেই হবে, আমাদের ওখানে যেতেই হবে। এদের বহু কষ্টে ঠেকান যায় নানান অজুহাত দেখিয়ে। আবার বাইরে থেকে টেলিগ্রাম আসে। অমুক কনফারেন্সে এই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত আমরা সভাপতি হিসেবে পেতে চাই।

কেউ লেখেন, উদ্বোধন করতে হবে। কেউ লেখেন, প্রধান অতিথি হতে হবে। এর

মধ্যে দুখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। আসতেই হবে। এক-খানা টেলিগ্রাম এসেছে ভূমিকম্পের যে বিধান আছে তা তুলে দেবার জন্যে আমরা মিছিল করব। অবিলম্বে চলে আসুন।

তেমনিতর এটাও একটা-কিছু ভেবে টেলিগ্রামটা খুলে একটু চঞ্চল হলাম। যম দত্ত টেলিগ্রাম করেছে।

"নিখিল জগৎ পণ্ডিত সভা 'ভূত নাই' বা 'ভূত থাকতে পারে না'—প্রস্তাব পাশ করাবার জন্য বিরাট কনফারেন্স করছে। ইতিমধ্যেই চারিদিকে পোস্টার পড়েছে। ভূত নাই, ভূত নাই, ভূত নাই। ভূত ছিল না, ভূত নাই, ভূত থাকবে না এই নিয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা প্রবন্ধ লিখেছেন। ভূতকে এই সময়ে প্রমাণ না করলে সর্বনাশ হবে। সুতরাং প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করে ফেল। পার তো একটা ট্রেন-বোঝাই ভূত সঙ্গে নিয়েই চলে এস। খরচের জন্য ভেবো না। ভূতভক্ত মানব মহাসভা সকল খরচ দিতে প্রস্তুত।"—জে এম ডাট।

* * *

এখন ঠ্যালা বোঝ। বরাতটা একবার শোন। "ট্রেন রিজার্ভ করে এক ট্রেন-বোঝাই ভূত নিয়ে এস।"

খরচের জন্য ভাবনা নাই, সে সমস্তই দেবে 'ভূতভক্ত মানব মহাসভা।' 'ভূতভক্ত মানব মহাসভা'র কথা অবশ্য জানি। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের শাখাপ্রশাখা আছে। সকল জাতের লোকই এর সভ্য। শুধু বিজ্ঞানবাদী দেশগুলো আর সমাজতন্ত্রী দেশগুলোতে প্রকাশ্য কোন শাখা সমিতি নেই কিন্তু গোপনে গোপনে এই ভক্তি পোষণ করে। আগে এদের প্রবল প্রতাপ একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু এখন তো এদের প্রায় শেষ দশা বললেই চলে। কারণ বিজ্ঞান আর সমাজতন্ত্রবাদ সব দেশেই ধ্বজা উড়িয়ে ভূত নেহি হ্যায়, ভূতলোক মুর্দাবাদ, পেতনীরা সব বরবাদ যাক—বলে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। সুতরাং ট্রেন-বোঝাই করে ভূত আনাবার মত উৎসাহ উদ্যোগ টাকা জোটালে আসবে কোত্থেকে।

এক ট্রেন-বোঝাই ভূত। একবার আস্পর্ধাটা বোঝ।

একটা ভূতের নাগাল পেলাম না এই ক'দিনে আর এক ট্রেন-বোঝাই ভূতের বরাত বায়নাক্কা।

দুপুরবেলা খবরের কাগজ আসে। এক চোখে ছানি পড়া গোপেশ্বর দাস কাগজ দিয়ে গেল, কাগজেও দেখলাম মোটামোটা হরফে হেড লাইন দিয়েছে, সারা বিশ্ব সর্বনাস্তি মহা-বিজ্ঞানবাদী সভার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। দ্বিতীয় লাইনে—ভূতনাস্তি প্রস্তাব প্রণয়ন প্রস্তুত। তৃতীয় লাইনে লিখেছে—এই প্রস্তাব পাশ হওয়া মাত্র ভূতদের সর্বনাশ। প্রস্তাবে লেখা হয়েছে—প্রস্তাব পাশ হইলে সাধারণ মানুষেরা ঐ প্রস্তাব বলে ভূতদের পিটাইয়া মারিয়া ফেলিতে পারিবে। জলে চুবাইয়া মারিতেও পারিবে। অথবা দেখা যাইবে তাহারা হাওয়া হইয়া গিয়াছে।

কাগজটার একটা পৃষ্ঠা জুড়ে সংবাদটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। আর একেবারে একটা

ওঁচা পৃষ্ঠায় থিয়েটার বিজ্ঞাপনের পাশে আধকলমে, এই এদের উলটো, ভূতভক্ত-মানব মহাসভার উদ্যোগের কথা ছাপা হয়েছে। তাও একটি এমন বিশেষণ জুড়ে দিয়েছে যে তাতেই মহাসভার সকল উদ্যম খতম হয়ে গেছে।

লিখেছে, 'হাস্যকর উদ্যম'।

তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, "তবে ট্রেন-বোঝাই করিয়া ভূত প্রতিনিধি আসিবে শুনিয়া মহানগরের বিদগ্ধ নাগরিকেরা উৎসুক হইয়া আছেন। লোকে বলিতেছে, যে দিন ডেলিগেট আসিবে সেদিন হাওড়া শেয়ালদা দমদম এরোড্রোম হইতে পথগুলির দুইধারের বাড়ির বারান্দা ছাদ আলসে ইতিমধ্যেই ভাড়া হইয়া যাইতেছে।"

আর এক প্যারাগ্রাফের পর যা পড়লাম সে পড়ে চক্ষু চড়ক গাছ।

"তিন-তিনটি সিনেমা কোম্পানী ইতিমধ্যেই এই ভূত মহাসম্মেলনের সংবাদে উৎসাহিত হইয়া তিনটি ছবির মহরৎ করিয়া ফেলিয়াছে। বেলগাছিয়া ব্রিজের মোড়ে, হাওড়া ব্রিজের মোড়ে, বি. টি. রোডের মোড়ে, শিয়ালদহ স্টেশনে, হাওড়া স্টেশনে সিনেমা কোম্পানীগুলি ভূত ডেলিগেটদের ট্রেন হইতে অবতরণ এবং শহরের রাস্তা ধরিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাওয়ার দৃশ্যগুলির ছবি তুলিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই দেশান্তরে এই ছবির অংশগুলি দেখাইবার কণ্ট্রাক্ট করিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুনিতেছি, কোন এক স্থান হইতে একখানা ভূত-বোঝাই স্পেশাল ট্রেন আসিতেছে। কেহ বলিতেছে, অমুকচন্দ্র তমুক ট্রেন-বোঝাই ভূত আনিবার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। কেহ বলিতেছে কণ্ট্রাক্ট নয়, লোকটার আর কাজ মিলিতেছে না; কেহ মুখে নামও লইতেছে না বলিয়া এখন ভূতদের লইয়া কোনও একটা পার্টি খুলিবার চেষ্টায় আছে।

পড়ে শুনে আমার আপাদ-মস্তক যেন জ্বলে গেল।

ইচ্ছে হল এক ট্রেন ভূত পেলে, কোন স্টেজ ভাড়া নিয়ে ভূতনৃত্যটা দেখিয়ে দিতাম।

ক্রমে ক্রমে রাগটা এসে যেন নিজের উপর পড়ল। তারপর গিয়ে পড়ল যম দত্তের উপর। তারপর গিয়ে পড়ল পৃথিবীতে যারাই ভূত বিশ্বাস করে তাদের উপর। তার চেয়েও বেশি রাগ হল ওই ভূতদের অলীক অস্তিত্বের উপর। মনের ওই মিথ্যা বিশ্বাসটার উপর, ইচ্ছে হল শব্দ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানিয়ে থুথু ফেলে বলি, থু-থু-থু। নিজের কুসংস্কারের উপর থু; মিথ্যে ভয়ের উপর থু। ভূতের কল্পনার উপর থু। থু-থু-থু-থু।

চোখ বুজে চেয়ারে বসে থু-থু শব্দে থুথু ফেলতেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু কারুর গলা ঝাড়ার শব্দে থমকে গেলাম, এবং একটু চমকে উঠে চোখ খুলে দেখলাম—কে একজন ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু অপ্রস্তুত হলাম। অপ্রস্তুত থেকেও অবাক—মানে, বিস্মিত হলাম বেশি। আস্ত একটা জ্যান্ত মানুষ ফটক ঠেলে শান-বাঁধানো উঠোন মাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন অথচ কিছু টের পাই নি। আমি খানিকটা বেকুফের মত হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক একগাল হেসে অনেক আপ্যায়িত করে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, ঠিক

সময়ে এসেছি। নমস্কার স্যার।

নমস্কার। প্রতিনমস্কার করে একটু অপ্রস্তুত হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম দিব্যি ছিমছাম পোশাক, দস্তুরমতো পুরনো-কালের ধরনধারণের মানুষ। মাঝখানে চেরা সিঁথি, তেল চুকচুকে চুল, পাকানো গোঁফ, গায় পাঞ্জাবি, হাতে আংটি পায়ে পাম্প্ত। শৌখিন এবং সেকালের বাবু-কালচারের আসামী। লম্বা কোঁচাটা ধুলোয় লুটোচ্ছে। কাঁধে একখানা পাটকরা চাদর।

আমার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ওঃ, অনেক ভাগ্যি আমার যে, আপনাকে ঠিক পাকড়াও করতে পেরেছি। আমাদের গিন্নীমায়ের হুকুম ছিল, যেখানে থাকবেন সেখানে গিয়ে ধরতে হবে আপনাকে।

গিন্নীমা? কে গিন্নীমা?

আজ্ঞে, ভুবন মহলের নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন?

ভুবন মহল? সে কোথায়—

এই দেখুন। ভুবন মহল জগৎপুর জীবনগড় এ সবের নাম শোনেন নি? আপনার মত ব্যক্তি—

একটু চমকে গেলাম; নামগুলো খুবই চেনা। কিন্তু।

লোকটি বললে, ভুবনমহলকে ত্রিভুবনপুরও বলে। তিন-তিনটে বিরাট লাট নিয়ে তিন ভুবনপুর। ওপর ভুবনপুর মাঝের ভুবনপুর নিচের ভুবনপুর; এদেরই ছিট জমি নিয়ে হল আমাদের বাজে ভুবনপুর। ওপর মধ্যে নিচ তিন নাম হয়ে গিয়েছে, এখন বাজে। আর কোন্ বিশেষণ আছে বলুন। ছিট ভুবনপুরও হতে পারে। কেউ কেউ ছিট ভুবনপুরও বলে। ওই বাজে শিবপুরের মতন। তবে মাহাত্ম্য খুব। গুপ্ত কাশী, গুপ্ত বৃন্দাবন, যেমন নব বৃন্দাবনও বাজে হয়েছে আজকাল; তা আমাদের ভুবনপুরকে মাহাত্মিতে অনায়াসে নব কৈলেশ কি গুপ্ত কৈলেশ বলতে পারা যায়। বুঝেচেন না। সেই কোন বাদশাহী না আরও আগের সেই হিন্দু রাজা মান্ধাতার আমল থেকে নাকি এ ছিট ভুবনপুর কাশীর বাবা বিশ্বনাথের নামে দেবোত্তর চাকরান হয়ে আছে। বাবার নামে দেবোত্তর—ট্রাষ্টি হলেন অন্নপূর্ণা ঠাকরুন। এ মহল থেকে বাবা বিশ্বনাথের চ্যালা-চামুণ্ডা চাকরবাকরদের খোরপোশ হয়। গিন্নীমা হলেন গিয়ে এই বাজে ভুবনপুরের পত্তনিদার। শিব হলেন মালিক, অন্নপূর্ণা মা ট্রাষ্টি, তাঁর অধীনে গিন্নীমা গয়েশ্বরী চৌধুরানী হর্তাকর্তা বিধাতা বাজে ভুবনপুরের।

সেই নতুন মহল, ছিটমহল বাজে ভুবনপুরস্থ পত্তনিদারনী মহামান্যা গিন্নীঠাকুরানী প্রবল-প্রতাপান্বিতা গয়েশ্বরী চৌধুরানী আমাকে আপনার সমীপে প্রেরণ করেছেন। নির্দেশ, আপনাকে একবার যেতে হবে বাজে ভুবনপুরে অবিলম্বে। সুতরাং—। লোকটি হাসলেন কিন্তু শব্দ করলেন না—শুধু দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। সেটা অবশ্যই আমাকে কৃতার্থ করবার জন্য তা বুঝতে আমার বাকী রইল না।

পরিশেষে বললেন, আমি হলাম মহামান্যা গয়েশ্বরী দেবীর এজেণ্টো। মানে টুর করে

বেড়াই। মামলা মকদ্দমা করি। আপনাদের মত ব্যক্তির কাছে যাই। পোশাক দেখেই বুঝতে পারছেন।

লোকটার রং যেমন কালো, দাঁতগুলো তেমনি সাদা। বিশ্রী লাগে। তার সঙ্গে এই ধরনের কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে একটা বেশ পাড়াগেঁয়ে বা সেকালের সেই হুজুরী-হুজুরী হুমকি ফুটে উঠল।

বাজে ভুবনপুরের পত্তনিদারনী মহামান্যা গিন্নীঠাকুরানী মহামহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী—, শুধু গয়েশ্বরী ঠাকুরানী নয় মহামহিমার্ণবা। রাবিশ! যেন সেই বাদশাহী নবাবী আমলের খেতাবসুদ্ধ দু'গজি লম্বা একখানি নাম। হিন্দু আমলের মহারাজাদের—পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অশ্বমেধপরাক্রম, কৃপণদীন অনাথ-আতুরজন প্রতিপালক সমুদ্রগুপ্ত বা আবুল মুজফ্‌ফর মহীউদ্দীন মুহম্মদ ঔরংজীব বাহাদুর আলমগীর বাদশাহ গাজী! বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। কোম্পানীর আমলে আবার চামচিকে পক্ষীদের অর্থাৎ জমিদারদের খেতাব তার থেকেও বড়, মহামহিমমহিমার্ণব বহুজ-প্রতিপালক অশেষগুণান্বিত দোর্দণ্ডপ্রতাপ—ইত্যাদি ইত্যাদি—সে এ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র থেকে ও-পৃষ্ঠার অন্ততঃ মাঝামাঝি। উচ্চারণ করতে গেলে অন্ততঃ দুটো দম তো নিতেই হত। যদিই বা তিনটে না হয়।

একালে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের মত কালের যখন নতুন নাড়াবুনেরা পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ হয়ে কীর্তুনে বনে বিখ্যাত হচ্ছে এবং মনের খেদে সে কালের রায়বাহাদুর রায়সাহেব বা লেটার প্যাডে ছাপানো নামের আগের খেতাবগুলো কেটে দিয়ে মুখ রক্ষা করছে তখন এই লোকটা এমনই নির্লজ্জভাবে বলছে ছিটমহল বাজে ভুবনপুরস্থ পত্তনিদারনি মহামান্যা গিন্নী ঠাকুরানী প্রবলপ্রতাপান্বিতা শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী! এবং ওই কালো চেহারায় সাদা দাঁত মেলে হাসছে দেখ দিকি? যাত্রাদলের ক্লাউন বলে মনে হল। বিরক্তির আর সীমা রইল না আমার।

আমি তার দিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। কারণ কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি, সঙ্গে সঙ্গে রাগও হচ্ছে। কিন্তু তা প্রকাশ করতেও পারছি না চক্ষুলজ্জায়। সেই কারণে অন্যদিকে তাকিয়ে তাকে বললাম, মাফ করবেন, আমার সময়ও নেই এবং সম্ভবপরও নয়।

লোকটি হাঁ-হাঁ করে উঠল, আরে মশাই, আরে মশাই—বলতে নেই, বলতে নেই। গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর নিমন্ত্রণ।

লোকটার কথার ধরনধারণ যেমন বিশ্রী তেমনি যেন উদ্ধত। জমিদারি উঠে গেছে, কিন্তু জমিদারী চণ্ড কেতা মরেও মরে নি। মরে ভূত হয়ে বেঁচে আছে। খুব খারাপ লাগল আমার। মেজাজ চটে গেল। নিজেকে সামলাতে না পেরে রুক্ষভাবেই বলে ফেললাম, গয়েশ্বরী ঠাকুরুনের নেমন্তন্ন! গয়েশ্বরী ঠাকুরুনের নেমন্তন্ন! কিন্তু নেমন্তন্নটা কিসের? পিণ্ডি খাবার না ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের—

কথার মাঝখানেই লোকটা অসভ্যের মত অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল—হা-হা-হা-হা-হা-হা-

হা—। হি-হি-হি-হি। খি-খি-খি-খি—

হা-হা, হি-হি, খি-খি শব্দে তৈরী সে-হাসি গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর খেতাবসুদ্ধ নামের চেয়েও লম্বায় আধহাত বেশি তো হবেই। হাতখানেক হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, সে হাসি বিকট, উৎকট এবং অসভ্য। শরীরে রোমাঞ্চ হয়। পিলে চমকায়।

বললাম, থামুন মশায়, এমন করে হাসবেন না।

হাসি খানিকটা কমিয়ে সে বললে, হাসি কি সাধে মশায়! হাসছি আপনার কথা শুনে। আশ্চর্য মশায়, আশ্চর্য। আপনি যেন সর্বজ্ঞ। কথাটা যা বলেছেন না, সে একেবারে মোক্ষম। একেবারে কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি গেলেন। প্রায় নির্ভুল। নেমন্তন্নটা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন—খোদ গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর বাপের শ্রাদ্ধের সভায় আপনার নেমন্তন্ন। তবে পিণ্ডি বাপকে দেবেন। আপনাকে খাওয়াবেন না।

থমকে গেলাম চমকেও উঠলাম। গয়েশ্বরী ঠাকুরানী কে তাই জানি নে, তা তাঁর বাপের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ? কেন? বললাম, তাঁর সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই। এবং তাঁর বাপ এমন একটা কোন মহাত্মা নন বা বিখ্যাত নন যে তাঁর গুণগান করতে যেতে হবে আমাকে। আর আমি বামুনের ছেলে হলেও বামুনপণ্ডিতি করি না। পুরোহিতের কাজও করি না। সুতরাং গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমি পারছি না, মাফ করবেন আমাকে।

ভদ্রলোক বললেন, বলতে নেই বলতে নেই এমন কথা বলতে নেই। বাপ্ রে, গয়েশ্বরী ঠাকুরানীকে এমনি কথা বলতে আছে?

এবার আর রাগ বাগ মানলে না। লাগাম ছিঁড়ে সামনের দুটো পা-তুলে দাঁড়ানো ঘোড়ার মত একেবারে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে। বলে উঠলাম, শাট্ আপ। গয়েশ্বরী গয়েশ্বরী গয়েশ্বরী, কে আপনার গয়েশ্বরী?

কে আপনার গয়েশ্বরী? বলে উঠল লোকটা। তা হলে বলি শুনুন, বলে লোকটা এবার একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তর্জনী হেলিয়ে চোখ বড় বড় করে বললে, শুনুন স্যর, গয়েশ্বরী কেউ-কেটা নন। মহিমার্ণবা মহিলা। বিরাট ব্যক্তির কন্যা। একমাত্র কন্যা। বিরাট ব্যক্তিটি হলেন একজন মস্তবড় মহান্ত। বিরাট দেবোত্তর সম্পত্তি পত্তনি নিয়ে মহান্তগিরি ছেড়ে বিয়ে-সাদি করে সংসারী হয়েছিলেন। নিজে বড় একটা বের-টের হতেন না। মানে লজ্জা পেতেন। মহান্তগিরি ছেড়ে বিয়ে করেছিলেন কিনা! লোকে ঠাট্টা করত। আর প্রবল প্রতাপ ছিল। সেই তিনি এবার দেহ রেখেছেন। তাঁরই শ্রাদ্ধ করবেন গয়েশ্বরী। খুব গুণবতী মহিলা। এককালে রূপবতীও ছিলেন। তবে বয়স হয়েছে এখন। হলে কি হবে? এই বয়সে প্রাইভেটে বার তিনেক এম-এ পাস করেছেন। আলট্রা মডার্ন মহিলা। অবশ্য একটু গোপন কথা আছে। স্বামীর বাড়ি যান না। ভয়ানক মত-বিরোধ। স্বামী হলেন রাজা লোক। কিন্তু তিনি রাজ্যের অধিকার ছেড়ে দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন। মন্ত্রী হিসেবেই তিনি শাসন করেন। তিনি রাজ্য থেকে পুজো-পার্বণ সব

উঠিয়ে দিয়েছেন। ধর্মকর্ম সব বরবাদ করে দিয়েছেন। ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর পীরোত্তর গড়োত্তর সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। এই নিয়ে বুয়েছেন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। স্বামী বলছে—এমন প্রতিক্রিয়াশীলা ব্যাকডেটেড স্ত্রী আমার চলবে না। স্ত্রী বলছে, তুমি যাবে কোথায়! সাত পাক ঘুরে বিয়ে করেছি তোমাকে, চোদ্দ পাকেও তা খুলবে না।

এই ব্যাপার। হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছে। এখন বাপের মৃত্যুতে হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করবেন। তাছাড়া তো মশায় দেশের আইন হল পিণ্ডি দিয়ে তবে ধনসম্পত্তি পেতে হয়। "পিণ্ডং দত্বা ধনং হরেৎ।" আপনাকে নেমন্তন্ন সেই জন্যে। আপনি তো ভূতযোনি, প্রেতযোনি, পরলোক স্বর্গ নরক সম্পর্কে রিসার্চ করেছেন এবং আপনার একেবারে স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, এসব হল বোগাস, সব রাবিশ, বাজে কথা। সেই আপনিই সাক্ষী থাকবেন যে গয়েশ্বরী দেবী আলট্রা মডার্ন হয়েও বাপকে পিণ্ড দিয়েছেন। বুঝলেন না, তা হলে আর বাপের সম্পত্তি পেতে ঠাকরুনের কোন কষ্টই হবে না। এই আর কি! আর হাজার হলেও গয়েশ্বরী ঠাকরুনের বাবা, তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে ভাল কথা বলবেন আর কি।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আপনি দয়া করে আসুন। আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমি অক্ষম।

লোকটার সঙ্গে চোখ জুড়তেও ভাল লাগছিল না, আমি মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। তাকালাম গ্রামের পূর্বদিকের আকাশের দিকে। আকাশে আকাশ-ভরা নক্ষত্র ফুটে রয়েছে। ক'দিন আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। শূন্যলোকে এতটুকু মালিন্য নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হলেও নক্ষত্রের আলোয় একটা আলোর আভাস ভেসে রয়েছে আকাশের কোল থেকে মাটির বুক পর্যন্ত। গ্রামের গাছগুলোর মাথা আকাশের পটভূমিতে ঘনকালো-মাথা জটেবুড়োর মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—অনেকগুলো জটেবুড়ো যেন মাটির উপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জটাভরা মাথা নিয়ে কোন একটা জটলা পাকিয়ে তুলতে চাচ্ছে। অল্প অল্প বাতাসের আন্দোলনে তাল গাছের পাতার আন্দোলন ও শব্দের মধ্যে যেন ওরা মাথা নেড়ে নেড়ে ফিসফিস করে মন্ত্রণা করছে বলে মনে হল।

সমস্ত দেহ মন যেন কেমন শিরশির করতে লাগল। কেমন যেন একটা কেমন-কেমন গন্ধ, কেমন যেন মধ্যে মধ্যে খুব হিমেল একটা বাতাসের ঝলক, কেমন যেন। কি ব্যাপার ভাল করে যাচাই করবার জন্য একবার চারিপাশ দেখে নিতে চাইলাম। দেখলাম, সেই লোকটা বসে বসে তাল গাছের পাতাগুলোর দুলুনির সঙ্গে বেশ মিল রেখে মাথা দোলাচ্ছে।

আমি চটে গিয়ে বললাম, ও কি হচ্ছে? মাথা দোলাচ্ছেন কেন?

লোকটা—খুঁ-খুঁ-খুঁ-খুঁ করে হেসে উঠল।

অত্যন্ত বিশ্রী হাসিটা। বললাম, হাসছেন কেন?

সে বললে, ভয় লাগছে নাকি? তাঁ-হুঁলে—

আমি রাগে অধীর হয়ে উঠলাম, ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দি। কিন্তু

ভদ্রতায় বাধছিল। তাই রাগটা প্রকাশ করবার জন্য চিৎকার করে ডাকলাম—রা-ম! রা-ম! ইচ্ছে, রাম এলেই বলব, যা এঁকে বাইরের ফটকটা খুলে দে। কিন্তু তা আর করতে হল না। লোকটাই খুব ভয় পেয়ে বললে, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। সে যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। কয়েক পা, কি কয়েক গজ দূরে গিয়েই ফটকের উপরের বড় বোগেনভেলিয়া গাছটার ছায়ায় তলায় যেন হারিয়ে গেল।

লোকটার ভয় দেখে কৌতুকে খানিকটা না-হেসে আমি পারলাম না। এই সব বড়লোক জমিদার, রাজাদের টাউট-ফাউটগুলো এমন ভীতু হয়, বিশেষ করে শক্ত লোকেদের কাছে, যে এদের তুলনা একমাত্র শেয়ালের সঙ্গে। ঠিক শেয়াল। যত ভীতু তত চতুর।

আমি চোখ বন্ধ করে ওই লোকটার কথাই ভাবতে লাগলাম।

সামনের টেবিলে একটা ঠুক করে শব্দ হল এবং রাম বললে, চা।

ফিরে তাকালাম। চায়ের কাপটা রাম নামিয়ে দিয়েছে এবং অন্য একটা কাপ হাতে নিয়ে চারিদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজে, তাকে না পেয়ে আমাকে বললে, সি লোকটি?

বললাম, লোকটি নেই। বলবার সময় মনে মনে একটু আপসোসও হল। শুধু ভয়েই পালায় নি, লোকটি সম্ভবতঃ একটু রাগ করেও এমন ভাবে চলে গেল। নমস্কার করতেও ভুলে গেল। বড়লোকদের কর্মচারীদের রীতি-চরিত্র এমনই বটে।

বললাম, তাহলে চলে গিয়ে থাকবে। তা যাক্ গে, নে। ওরা এমনি বটে। এখন জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে রাখ। কালই কলকাতা ফিরব।

রাম বিস্মিত হল একটু। সে বললে, কাল-অ ফিরিবে? বলেছিলে না, অনেক-অ দিন-অ থাকিবে।

বললাম, থেকে কি করব? যার জন্যে এসেছিলাম তাই হল না তো মিছিমিছি বসে থাকব কেন?

রাম করুণ কণ্ঠে বললে, ভূত-অ পাইলে না? আসিথিলি তো ভূত-অ খুঁজিতে?

হ্যাঁ। তা দেখলাম ভূত নাই।

রাম প্রায় কেঁদে ফেললে.আমার কথা শুনে। বললে, ভূত-অ নাই?

না।

রাম এবার কেঁদেই ফেললে সত্যিসত্যি। ফোঁসফোঁস শব্দ করে চোখ নাক মুছতে লাগল। আমি বললাম তার জন্যে কাঁদছিস কেন? ভূত নেই তার জন্যে কান্নার কি আছে?

রাম এবার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললে, তা হলি মরি কি হইব? কোথা যিব? হে জগবন্ধু!

এবার চমকে উঠলাম। রাম যে কথাটা বলেছে সে তো সোজা কথা নয়; কথাটা শুনতে সোজা সহজ কিন্তু আসলে তো তা নয়। হে ভগবান্! ভূত যদি নাই তবে মরণের পর মানুষদের হবেই বা কি এবং তারা যাবেই বা কোথায়?

রাম বললে, কিন্তু ভূত তো ছিল।

হ্যাঁ। তা ছিল।

ভূতের ঢেলা খেয়েছি, ভূতের কীর্তির কথা শুনেছি। সুতরাং কি করে বলব ভূত ছিল না।

ভূত ছিল তো কি হইল? কোথা গেল? মরি গেল?

হ্যাঁ তাই। আগে ছিল যখন এখন নেই যখন, তখন মরেছে বই কি?

হঠাৎ রাম প্রশ্ন করে বসল—মানুষ মরিলে তো ভূত হইছিল?

হ্যাঁ।

ভূত মরিলে কি হইল?

কথাটা গুরুতর। অতি গুরুতর প্রশ্ন।

মানুষ মরে ভূত হয়। তাহলে ভূত মরে কি হয়? রাম আবার প্রশ্ন করলে, ভূত-অ আগে না মানুষ-অ আগে।

কি? ভূত আগে না মানুষ আগে?

প্রশ্ন আরও গুরুতর হয়ে গেল।

মানুষ মরে ভূত হত। ভূত ছিল। এখন ভূতেরা নেই সুতরাং ধরে নেওয়া গেল ভূতেরা মরেছে। তা মরল মরল বেশ করল কিন্তু মরে গেল কোথায়? মানুষ মরে ভূত হয়, ভূত মরে কি হয়? এবং ভূত আগে না মানুষ আগে?

গত কাল আগে, না আজ আগে? গত কালগুলো ভূত। আজ হল মানুষ। আগামী কাল কালকের মানুষ। আগামী কালকের মানুষের কাছে আজকের মানুষেরা ভূত হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে গত পরশুর ভূতগুলোর হল কি? হিসেব মত তো ভূত প্রতিদিনই সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার কথা। কারণ প্রতিদিনই লোক মরছে অজস্র। এবং প্রতিদিনের আজ অর্থাৎ বর্তমানকাল বিগত হয়ে গতকাল অর্থাৎ ভূতকাল হয়ে যাচ্ছে।

সব যেন জড়িয়ে পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল। ভূতগুলো যাচ্ছে কোথায়? মাথা ঘুরতে লাগল।

এরপর আর সব কথা ভাল করে মনে পড়ছে না। এইটুকু মনে আছে; আমি সারারাত প্রায় দিশে হারিয়ে নানান রকম বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম এবং আমার রাম সারারাত ফোঁসফোঁস করে কাঁদলে।

সেই কান্নায় বিরক্ত হয়ে আমি তাকে গালাগালি করলাম এবং ভূতদের গালাগালি করলাম। সকালে উঠেই চা কাপটিতে পর্যন্ত মুখ না দিয়েই ফাইল টেনে নতুন গবেষণা ফেঁদে বসলাম—ভূত মুর্দাবাদ।

ভূত মিথ্যা; ভূত ছিল না; ভূত নাই; ভূত হইবে না; বিলকুল ঝুট হ্যায়; মুর্দাবাদ ভূত মুর্দাবাদ।

ছয়

দেখতে দেখতে আসর জমে গেল।

টেলিগ্রাম আসতে লাগল। কি কাণ্ড, একি করতে যাচ্ছ তুমি ?

কেউ বললে, খবরদার খবরদার, ভূতের মার ভীষণ মার !

যম দত্ত টেলিগ্রাম করলে, তোমার কপালে অনেক দুঃখ। এক কিলেতেই পগার পার।

আমি কিন্তু কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করলাম না। আমার নতুন সিদ্ধান্তে অটল রইলাম।

ভূত মিথ্যা; ভূত ছিল না; ভূত নাই; ভূত হইবে না। বিলকুল ঝুট হ্যায়, ভূত মুর্দাবাদ।

রাম এসে দাঁড়াল সামনে। সারারাত্রি ভূতেদের জন্য কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো ফুলো-ফুলো হয়ে উঠেছে। বললাম কি রে ?

সে বললে, আজ-অ যাইবে তো ?

নিশ্চয়।

রাম বললে, রাত্তিরি হইবে তো হাবড়া পঁহুছিতে। গাড়ি লাগি টেলিফোন করি দিত্তি হবে তো। আর-অ।

জিজ্ঞাসা করলাম—আর কি ?

বক্তৃতা করিবে ত-অ।

নিশ্চয়।

তা'লি সিটাও লিখ-অ।

রামকে এইজন্যেই ভালবাসি। তার ব্যবস্থা নিখুঁত। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে প্রাণান্ত হয়; সে কথা ভোলেনি সে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে কলকাতার বাড়িতে চিঠি দেওয়া থাকে, সেই অনুসারে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে; ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের মধ্যেই গাড়ি পাই। কোন ঝামেলা থাকে না। এবার যাওয়াটা হচ্ছে হঠাৎ। সেই কারণে রামের হুঁশিয়ারী।

আমাদের ওখানে টেলিফোন হয়েছে নতুন। পোস্টাপিসের পাবলিক কল অফিসে টেলিফোন করতে পাঠালাম ভাইকে। ভাই ফিরে এসে বললে টেলিফোন হল না, সম্ভবতঃ কলকাতার বাড়ির লাইন খারাপ। কোন মতেই সাড়া মিলল না।

অগত্যা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম করলাম রাত্রে হাওড়া পৌঁছুব, গাড়ির ব্যবস্থা কর। টেলিগ্রামখানা দিতে গিয়ে মাথার মধ্যে পোকা নড়ে উঠল; আর একটা কাগজ টেনে নিয়ে আরও একটা টেলিগ্রাম লিখে বসলাম। যম দত্তকে টেলিগ্রাম করলাম।

রীচিং টু নাইট। অ্যারেঞ্জ ভেরী বিগ মিটিং। শ্যাল প্রুভ নো একজিস্টেন্স অব ঘোস্টস। নো ঘোস্ট নো ঘোস্ট নো ঘোস্ট! অল্ ঘোস্টস মুর্দাবাদ।

মনে মনে ভারী তৃপ্তি পেলাম। মনে হল বিজয়া দশমীর দিন রামলীলা ময়দানে বারুদ এবং খড়ে ন্যাকড়ায় এবং কাগজে রঙে তৈরী মিথ্যে রাবণের বিরাট ভয়ংকর মূর্তিটা যেমন রাম-বেশী কোন ছোকরার আগুন জ্বালানো তীরে বিদ্ধ হয়ে দাউদাউ করে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবেই আমার বক্তৃতার আগুনজ্বলা তীরের ঘায়ে এতকালের মিথ্যে ভয় ও সংস্কারের বারুদ ও দাহ্য-পদার্থে তৈরী ভূতটা দাউদাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

পুড়ছে আর আর্তনাদ করছে, বাঁবারে মাঁরে, গেঁলাম রে। মঁলাম রে। পুঁড়ে ছাঁই হলাম রে। রাঁজা পরীক্ষিৎ নাগযজ্ঞ কঁরেছিল আঁর এঁ করলে ভূঁতযঁজ্ঞ রে। নাগেদের আঁস্তিক মুনি ভাঁগনে ছিল, ভূতেদের কেঁউ নাঁই রে।

দাউদাউ করে জ্বলছে ভূতেরা আর ছাই হয়ে যাচ্ছে। অথচ এতটুকু দুর্গন্ধ উঠছে না। কারণ ভূতেদের দেহে তো মাংস নেই হাড় নেই চর্বি নেই, থাকবার মধ্যে আছে শুধু ছায়া। ছায়া পুড়ে ছাই। তার আর গন্ধ কিসের।

আর রামের মত লক্ষ লক্ষ রাম কেঁদে সারা হচ্ছে। ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। হায় মরে কোথায় যাব আমরা।

রামেদের কাতর ক্রন্দনে, নিদারুণ হতাশায়, অসহায় দীর্ঘশ্বাসে সারা আকাশ যেন ম্লান হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমারও যেন কান্না পেতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সজাগ হলাম সতর্ক হলাম। চোখের জল মুছলাম। এবং মনে মনে বললাম, ভূত মিথ্যে ভূত বোগাস ভূত বাজে—ভূত নেই, ছিল না হবে না। ভূত মুর্দাবাদ। ভগবান মুর্দাবাদ। দেবতা মুর্দাবাদ। ইন্দ্র মুর্দাবাদ। ব্রহ্মা মুর্দাবাদ।

কিন্তু।

আমার মনের মধ্যেই হঠাৎ একটা কিন্তু এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি?

কিন্তুটার শেষেই প্রশ্নটা এসে দাঁড়াল, কিন্তু যম?

উত্তরটা আটকে গেল। যম?

হাঁ। যম মুর্দাবাদ?

না, যম সত্যি। কারণ আজই ওপাড়ার গাঁজাখোর গবা বৈরাগী মরেছে, শিবে বাউরী মরেছে পাশের গাঁয়ে, ক্ষান্ত বুড়ী মরেছে এবং আমার কাছে খবর আসেনি আমি জানি না এমন লোক মরেছে। দৈনিক কত লোক গড়ে মরে তা পরিসংখ্যানে পাওয়া যাবে এটা স্বীকৃত সত্য।

ভূত মিথ্যে ভূত নেই। ভূত মুর্দাবাদ! কিন্তু যম সত্যি। যমকে জিন্দাবাদ বলি বা নাই বলি, যম ছিল যম আছে যম থাকবে।

তা হলে?

কি?

যম থাকলে যমপুরী?

তাই তো।

যমপুরীতে কারা থাকে ?

তাই তো।

আবার সব গোলমাল বেধে গেল। যমপুরী থাকলেই স্বর্গপুরী আসবে। শিবলোক ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক ইন্দ্রলোক।—কি মুস্কিল।

কিন্তু তবুও আমি শেষ পর্যন্ত জয়ী হলাম। মনে-মনে মনকে বেঁধে বললাম, ভূত মুর্দাবাদ।

* * *

বিকেল বেলা ট্রেন। স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ডাইনে বাঁয়ে পিছনে গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন। হঠাৎ চলে যাচ্ছি শুনে তাঁরা বেলা চারটে থেকেই এসে জিজ্ঞেস করছেন, কি ব্যাপার স্যর ? এখানে থাকব বলে এলেন, আর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ চলে যাচ্ছেন ? কি দোষ হোল আমাদের ?

বললাম, একটু রসিকতা করেই বললাম, কি করব ? গ্রামে একটা ভূতও বেঁচে নেই সব মরে বসে আছে। আজকের দিনের কেউই মরে ভূত হচ্ছে না যখন, তখন কি করে থাকব বলুন ? কি হবে থেকে ?

তারা মাথা চুলকে বললে, আমরা যে স্যর বেঁচেই ভূত হয়ে আছি, তা মরে আর ভূত হই কি করে। আর তার দরকারই বা কি বলুন। আমাদের দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন না।

বললাম, তা কি করে হবে বলুন ? আপনার ছায়া পড়েছে মাটিতে ওই দেখুন—ভূতের তো ছায়া পড়ে না। তারপর আপনি ইচ্ছে করলেই তাল গাছের মত লম্বা হতে পারেন না। বাঁশের মত লম্বা হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে লেবু পেড়ে এনে অতিথি সৎকার করতে পারেন না। আপনার কুলোর মত কান নেই মূলোর মতন দাঁত নেই ;

একজন অধ্যাপক বললেন, এ সমস্ত কথা কি আপনি সিরিয়াসলি বলছেন স্যর ?

নি শ্চ য়। ভ য়া ন ক। সিরিয়াসলি ভী—ষ—ণ সিরিয়াসলি। এই দেখুন কলকাতায় টেলিগ্রাম করেছি—মনুমেন্টের তলায় মিটিং হবে, তাতে আমি ঘোষণা করব, প্রমাণ করে ঘোষণা করব—মানে, ডেমনেস্ট্রেট করে ঘোষণা করব, ভূত নাই ভূত নাই ভূত নাই। ভূত বাজে। ভূত মিথ্যে। ভূতেরা সব মরে গিয়েছে

কি করে প্রমাণ করবেন ?

যে ভাবে ভূতেরা প্রমাণ দিয়েছে। ভূতদের ডেকে সাড়া পাইনি, খুঁজে দেখা পাইনি, ভূতুড়ে বাড়ির অন্ধকার কোণে কোণে লাঠি ঘুরিয়েছি, কারুর গায়ে লেগেছে মনে হয়নি। গাছতলা দিয়ে যেতে কোন ভয় পাইনি, আবার কি প্রমাণ ? এই তো এই যেখানে স্টেশন হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্ম, ওই যে প্ল্যাটফর্মের ধারে বট গাছটা এখনও রয়েছে, এই জায়গাটার নামই হল মড়া টাঙাবার ডাঙ্গা। এই সব বট গাছের ডালে আগে মড়া বেঁধে রাখা হত আমরা বলতাম গাছিয়ে রাখা। ডাঙ্গাটায় রাত্তির কালে ভূতেরা চেল ডিগডিগ খেলত।

শুনতাম নাকি অম্বুবাচীর সময় দিনে ওপাড়ায় হত মানুষের মুনিষে মুনিষে কুস্তি, রাত্রে এখানে হত ভূত-মুনিষে মুনিষে কুস্তি। কই? কোথায়? আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

কথাটা শেষ করতে পেলাম না, ভিড় ঠেলে একজন এগিয়ে এসে বত্রিশটি দন্ত বিকাশ করে এই এত বড় একখানি হাসি হেসে বললেন, নমস্কার স্যর! এই ট্রেনেই চলেছেন তাহ'লে?

যত বিরক্তি বোধ করলাম তত বিস্মিত হলাম; কারণ লোকটি আর কেউ নয়—কালকের সন্ধ্যের সেই মহামহিমার্ণবা গয়েশ্বরী গিন্নীঠাকুরানীর দেওয়ান বা দূতটি। কাল যেমন অকস্মাৎ কখন অদৃশ্য হওয়ার মত চলে গিয়েছিল আজও তেমনি হঠাৎ যেন আকাশ থেকে ঝড়ে পড়ল বা মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল বর্ষার কোন এক ভোরবেলায় রাত্রে-মাটি-ফুঁড়ে-ওঠা ওলের বা কচুর ডাঁটির মত। ভুরু দুটি আপনি কুঁচকে উঠল আমার। আমি বললাম, কাল থেকে ছিলেন কোথায়, এঁ্যা?

লোকটি বললে, কাল চলে গিছলাম আজ আবার এসেছি। আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে যেতেই হবে। না গেলে চলবে না।

চলবে না—মানে?

মানে যেতেই হবে স্যর।

যেতেই হবে। কথাবার্তায় তো দেখছি নবাবী বাদশাহী মেজাজ। যেতেই হবে।

আজ্ঞে না। একেবারে অতি বিনীত অনুরোধ। হাত জোড় করে অনুরোধ। বলে আবার সে দাঁত মেলে দিল। তবে হ্যাঁ, না গেলে আপনার ভাল হবে না—বুয়েচেন না।

কি মন্দ হবে? কি করবেন আপনারা?

ঘেরাও করব।

ঘেরাও?

হ্যাঁ, ঘেরাও করে আপনাকে আমরা নিয়ে যাব। আমরা পারি সব স্যর। বলিনি এতক্ষণ। এখন বলছি—পারি আমরা সব। বলে, সে লোকটা কৌতুকবশে একেবারে হা-হা শব্দে হেসে যেন ফেটে পড়ল।

আমিও রাগে ফেটে পড়লাম—শাট আপ বলছি, শাট আপ।

লোকটা আরও জোরে হাসতে লাগল। আমি এবং আমার সঙ্গের বিশিষ্ট গ্রামবাসীরাও সকলে অবাক হয়ে গেলেন। লোকটা কি?

একজন বলেই বসলেন—কোথাকার অসভ্য হে তুমি?

লোকটা হাসির ডিগ্রী আরও চড়িয়ে দিলে। হাসতে হাসতে সে বললে, চলুন না স্যর মা গয়েশ্বরী চৌধুরানীর বাপের শ্রাদ্ধে, সেখানে পণ্ডিতেরা আসবে—বাঘা বাঘা ব্রহ্মদত্যির মত পণ্ডিত। তারা প্রমাণ করে দেবে। চলুন না।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছিল। চারিপাশে লোক জমছিল। এবং অধিকাংশ লোকই ওই লোকটার উপর চটছিল।

আমাদের গ্রামের ছেলেছোকরারা জমে গিয়ে তারা চটে উঠল। ভয়ানক চটে উঠল।

এবং সাড়া উঠে গেল যে লাগাও চাঁটি। চাঁদা করে মারো চাঁটি। জন দুই-তিনের হাতও উঠল। আমি তো দস্তরমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কারণ ছেলেগুলি আজকালকার ছেলে, এদের হাত উঠলে সেকালের রানা মহারানাদের উদ্যত হাতের মত কারুর মাথা না নিয়ে নামে না। কিন্তু লোকটা অদ্ভুত। চট করে বসে পড়েই হোক আর ঠেলাঠেলি করেই হোক, কোন এক বিচিত্র উপায়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে চলে গেল—স্টেশন প্ল্যাটফর্মের গায়ে যে প্রকাণ্ড বট গাছটা আছে সেই গাছটার দিকে। এবং গাছটার আড়ালে যেন লুকিয়ে পড়ল।

ছেলেগুলি ছুটে গেল তাড়া করে কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রায় ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে ইন করলে যার জন্য আমিই বললাম, থাক থাক, যেতে দাও যেতে দাও। ট্রেন এসে গেছে আর হাঙ্গামা কোরো না।

* * *

ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। আমাদের স্টেশন ছেড়ে কাটোয়া পর্যন্ত আর কোথাও দাঁড়াবে না। কাটোয়াতে নেমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন। সেই ট্রেনে কলকাতা। ট্রেনখানা চলেছিল ফুল স্পীডে। আর গাড়িখানা সেই স্পীডের জন্য খুব জোরে-জোরে দুলছিল। এত জোর দুলুনী যে দোলার চোটে বারবার খোলা জুতো জোড়াটার একপাটি ঐ-দিকে একপাটি ও-দিকে যেন রাগারাগি করে কামরার বাইরে চলে যেতে চাচ্ছিল। এবং আমার মাথাটা ক্রমাগত কামরার দেওয়ালে ঠকোঠকো ঠক্, ঠকোঠকো ঠক্ শব্দে যেন তবলায় ঠেকা দিচ্ছিল। ট্রেনের চাকায় এবং লাইনে আশ্চর্য এক যন্ত্রসংগীত বাজছিল। ঘটা ঘং ঘটা ঘং ঘটাঘং ঘং ঘট ঘং ঘটাঘং ঘটাঘং ঘং। শুধু ধরা যাচ্ছিল না—রাগ বা রাগিণী যাই হোক, সেটা কি ?

আমি ওই যন্ত্রসংগীতের ঘটাঘণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে গুনগুন করছিলাম ভূতো তাং ভূতোতাং ভূতোতাং তাং। মিথ্যাং মিথ্যাং মিথ্যাং থাং।

ভাবছিলাম একটা পুরো গান যদি বানিয়ে নিতে পারি তাহলে আগামী কালকের বা আগামী পরশুর মিটিংএ সেটাকে উদ্বোধন সংগীত হিসেবে গাইয়ে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম কলিটা এসেও গেল।

মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা—বিলকুল মিথ্যা—। আ—
ভূত-প্রেত ব্রহ্ম-দৈত্যি একদম মিথ্যা—। আ——।
গাঞ্জা—গাঞ্জা—যোল আনা গাঞ্জা—।
কষিবারে পাঞ্জা—। বাড়ালাম হস্তং।
ভূত হও প্রেত হও চলে আও—কস্তং—।
বাড়ায়েছি হস্তং—

ঘটা ঘং ঘটা ঘং ঘটা ঘটা ঘং ঘং। ট্রেনটার চাকার শব্দ চমৎকার ভাবে হস্তং এবং কস্তং-এর সঙ্গে মিলে গেল। আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম সেই অন্ধকার হয়ে আসা সন্ধ্যার সময়, যাকে আগের কালে আমার পিসীমা বলতেন 'তিনি সন্ধ্যাবেলা'। ঐ সময়টা না-দিন না-রাত্রি। অন্ধকারের মধ্যে দিনটা ডুবে যাবার ঠিক মুখটা। হয় কিনারা নয় সিংহদ্বার।

দিন হারায় অন্ধকারে, তার মানে দিন মরে। আগের কালে বলত দিন মরে রাত হয় যেমন মানুষ মরে ভূত হয়। রাত কালটা ভূতের কাল। ভূতেদের যত চোরফুটি এই রাত্রির অন্ধকারে।

পিসীমা বলতেন, সন্ধ্যে হল সুয্যি ডুবল; পাখিরা কলকল কলকল করে ডেকে বাড়ি ফিরল। ওদিকে বেল গাছের ডালের উপর ঘুমন্ত ব্রহ্মদত্যির ঘুম ভাঙল; ন্যাড়া-মাথা ব্রহ্মদত্যি উঠে বসে হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিয়ে আওড়াতে লাগল, পুণ্যশ্লোক নাগাবাবা পুণ্যশ্লোক জটাধারী, পুণ্যশ্লোক নন্দীভৃঙ্গী ভূতপ্রেতের অধিপতি।

ওদিক গ্রামের বৈরিগীপাড়ার ধারে বৈরাগীবাবাজীদের সমাধি থানে সেই প্রকাণ্ড বড় নিম গাছটার ডালে বৈরাগীবাবাজী ভূতও তখন উঠে বসেছে এবং মাথার মাঝখানে সেই লাউয়ের বোঁটার মত মোটা টিকিগোছটার গিঁঠ খুলতে খুলতে আওড়াচ্ছে—

"অনন্ত ভূতের লীলা অনন্ত মহিমা
ত্রিসংসারে কেহ তার দিতে নারে সীমা;
সংসারে আঁতুড় হতে শ্মশান পর্যন্ত
ভূতের ভূতুড়ে কাণ্ড রূপও অনন্ত,
আঁতুড়ে পাঁচুয়া রূপে করে অধিষ্ঠান—
তার সঙ্গে পেত্নী লয় পোয়াতীর প্রাণ,
শ্মশানে পিশাচরূপে করয়ে ভ্রমণ,
বৈরাগীর সমাধিথানে গোসাঁই সুজন;
কবর আস্তানে হে মামদো জবরদস্ত
বিক্রমে রাজত্ব কর ফেলিয়া বেহস্ত;
কেরেস্তানী গোরস্তানে ফাদার ভূতের রাজ্য।
সকল স্মরণ করি শুরু রাতের কার্য।"

এইখানে হাতজোড় করে নমস্কার করত, তারপর ছড়ার সুর পাল্টে নতুনসুরে ছড়া ধরত—

"ঘোস্ট যত টোস্ট খায় তার সাথে চাহে চাঁহা—
মামদোরা নাস্তা করে, কোর্মা গোস্ত খেয়ে—আহা।
বৈরাগীবাবাজী সবে মালপো লাগি হল সারা—
জমিদার ভূতের বাড়ি হরি বলে গিয়ে দাঁড়া।
যা দেয় মন তাই ভালোরে, ভিক্ষের চাল
আবার কাঁড়া আকাঁড়া।"

সে কাল এক আশ্চর্যকাল। মহাঅরণ্যে যেমন পাতা পড়লে কুলো হয়, ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, তেমনি সে-কালে রাজা-প্রজা নায়েব গমস্তা দারোয়ান হাতি ঘোড়া কুকুর বেড়াল দাস দাসী গেরস্ত ফকীর বাউল বৈরাগী সকলকেই মরে ভূতে হতে হত।

আমার পিসীমা বলতেন, হ'ত নয়, এখনও হ'তে হয় এবং চিরকাল হ'তে হবে। বলতেন, রাজা জমিদার ধনী ভূতেদের বাস ছিল বিরাট বিরাট ভাঙা বাড়িতে; সেখানে সন্ধ্যের মুখে ভূতেদের রাজ্যের কাজ শুরু হতেই শোরগোল উঠত, লোক-লশকরেরা সারাদিন ঘুমিয়ে উঠে তাড়াহুড়ো করে কাজ শুরু করে দিত। দরওয়াজার মুখে অদৃশ্য ফটক খোলার শব্দ উঠত; সিপাহী দারোয়ানরা নালমারা জুতো পরে মাঠের মধ্যে শব্দ তুলত। ঘোড়াশালে ঘোড়াভূত ডেকে উঠত, হাতিশালে হাতিভূত, উটশালে উটেরা; ওদিকে গাছে যত পাখিভূতেরা কলকল করে ডাকতে থাকত। কা—কা—কা—। কুহু—কুহু—কুহু—কিচির কিচির কিচির; মুরগীরা সকালে যেমন কোঁকর কোঁ কোঁ শব্দে ডাকে, সন্ধ্যের মুখে ভূতমুরগীগুলোও কোঁকর কোঁ কোঁ শব্দে ডাকে—তবে এদের কোঁকর কোঁ-এ দুটো ক'রে চন্দ্রবিন্দু যোগ হয়েছে; সারাদিন বাছুর-ভূতগুলো আটক থেকে সন্ধ্যের সাড়া পেয়ে ক্ষিদের চোটে ডেকে ওঠে—হাম বাঁ। বাঁ্যা—বাঁ্যা।

গাইভূতগুলোর মোড় টাটিয়ে উঠেছে তখন দুধের চাপে। কাতর হয়ে তারাও ডাকে হাম্বা। হাম্বা শব্দ শুনে দেওয়ানজী ভূত ডাকেন, ওঁরে বেঁটা রাঁখালে ভূত। গাঁই দুঁইয়ে ফেঁল, গাই দুঁইয়ে ফেঁল। শুনছিস না অন্দরের তাঁগিদ।

অন্দরে তখন খোকাভূতেরা কাঁদতে শুরু করেছে। ক্ষিদে পেয়েছে, দুধ চাই।

পদী ঝিভূত্‌নী খোনা গলায় ঝঙ্কার তুলে বলে উঠত—মঁরণ। আঁকেল-খেঁগো দেঁওয়ান কোঁথাকার। ছোটবাবু চাঁহা চাঁহা করছে, বঁড় কর্তা আঁফিং খাঁবে সে কঁথা এঁকবাঁর বলে না গো। বঁড় গিন্নী উঁঠে চাঁ না পেঁলে মাথা খাঁবে।

শুধু তাই নয়। বর্ণনা, পিসীমা দিতেন, নিখুঁত বর্ণনা। বলতেন, কাকভূত কোকিল-ভূতের কলকল থামতেই ছেলেভূতেরা পড়তে বসে কলকল রব তুলত। একসঙ্গে সুর করে পড়ত—

"সাঁরাদিন ঘুঁমাইয়া সাঁঝ বেঁলা উঁঠে
ভূঁতেদের পুঁত মোঁরা মঁন দিঁনু পাঁঠে;
ভূঁতেদের কাঁজ শুন ভূঁত পুঁত সঁব
সাঁরারাঁত ভূত নেত্য ভূত উঁপদ্‌রব।
দুপদাপ ঢেলা ফেল ঝর ঝর ধুলা
ধেই ধেই ধেই নাচনে দোলারে গাছগুলো।
গাছতলা দিয়ে যখন মানুষেরা যাবে
পা-খানি বাড়ায়ে তার মাথায় ঠেকাবে,
খোনাসুরে কথা বলে খিল খিল হেসে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বাছা টেনে ধর কেশে।
মুলো মুলো দাঁতে দাঁত কড়মড় ঘষি
তাইরে নারে না গান ধর সোনা কষি।"

পিসীমা বেশ সুর করে পড়তে পারতেন। ভারী ভাল লাগত আমার। পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল থেকেও ভাল লাগত।

ভূতেদের পাঠ্যপুস্তকের কবিতাটি পর্যন্ত পিসীমা সেকালে বাপ-পিতামহের কানে শুনে শিখেছিলেন। তাই বা কেন, হয় তো নিজেই কানে শুনে শিখেছিলেন। পিসীমা আফিং খেতেন, মোটা এক ডেলা আফিং। সন্ধ্যে আটটার পরই চা সহযোগে আফিং খেয়ে ঢুলতে বসতেন—তখন ওই আধো-তন্দ্রা আধো-জাগরণের মধ্যে পৃথিবীর মানুষের কথা শুনতে পেতেন না। পৃথিবীর মানুষরা যা শুনতে পেতো না সেইসব কথা শুনতে পেতেন।

পেতেন, এই কথা বলতেন তিনি। তিনি কেন, সেকালে সকল লোকই বলতেন। বলতেন কেন, সত্যই শুনতেন, শুনতে পেতেন। শুধু আমাদের দেশে কেন সকল দেশের মানুষরাই শুনতেন এবং দেখতে পেতেন। কিন্তু—

আমার অন্তর তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের মেহের আলির মত চিৎকার করে উঠল, সব ঝুট হ্যায়। ও ভূতগুলোর কাউকে যদি এখন সামনে পেতাম তাহলে নাকের কাছে ঘুঁষি ঝেড়ে দিয়ে বলে উঠতাম—তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকিতে সারা ট্রেনখানা ঝনঝন ঝরঝর ঝরঝর ধরনের একটা প্রচণ্ড শব্দ তুলে যেন উল্‌টে যাচ্ছে বলে মনে হল। চমকে উঠতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। তার আগেই যেন কি হয়ে গেল। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বা যাচ্ছিলাম। কিন্তু গেলাম না। অর্থাৎ অজ্ঞান হলাম না। আঘাত পাবার আগেই যেন একজন কেউ আমাকে জানালা দিয়ে বার করে নিয়ে এল।

আশ্চর্যের কথা এ-হল সেই লোকটি, সেই অবাঞ্ছিত কালকের এবং আজকের লোকটা। বাজে বা ছিট-ভুবনপুরের গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর সেই প্রগল্‌ভ দূতটি আমাকে রক্ষা করলে। ট্রেনখানা যখন হুড়মুড় ঘটমট ঝনঝন বা ঝরঝর করে উলটে পড়তে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সেই লোকটা লাফিয়ে আমার কামরাখানার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে সেই দাঁত বের করেই বললে; বেরিয়ে আসুন স্যার জানালা দিয়ে। বেরিয়ে আসুন। নইলে গেলেন। মাথাটা গলিয়ে দিন জানালার বাইরে।

তাই দিলাম। লোকটা আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তার সেই বিচিত্র লম্বা হাতখানার উপর শুইয়ে দিব্যি বের করে এনে লাইনের পাশে একটা গাছের ধারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

মাথাটা যেন ঝিমঝিম বা টিমটিম বা টনটন কি কনকন এমনি একটা কিছু করছিল। লোকটি হেসে বললে, ও ভালো হয়ে গেছে। দেখুন না, ভালো হয়নি?

সত্যিই ক্রমশঃ ভালো বোধ করছিলাম। বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু হল কি? ঘটল-টা কি?

লোকটি বললে, দেখুন না। আপনার কামরাটারই চাকা লাইন থেকে সরে গেছে। খুব ভাগ্যি একদম উলটে যায়নি।

আকাশে চাঁদ ছিল শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী সপ্তমীর চাঁদ। হালকা জ্যোৎস্নার মধ্যে খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে গেছে মাঠের মধ্যে। ইঞ্জিনটা

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোঁ শোঁ শব্দে ডাক ছাড়ছে, লোকজন সব গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দেখছে কি হয়েছে। আমার কামরাখানা ছিল ফার্স্ট ক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস কম্বাইণ্ড বগি। আমিই একলা যাত্রী ছিলাম তাতে। এই গাড়িখানার চাকা লাইনচ্যুত হয়ে ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে গেছে। ট্রেনের লোকেরা আমার কামরাখানার কাছেই ভিড় জমিয়েছে। শুধু প্যাসেঞ্জাররাই নয়। হঠাৎ চোখে পড়ল, লাইনের ওপারে মাঠের মধ্যে যেন কালো কালো ছায়ার মত অসংখ্য লোক। অসংখ্য লোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—ওরা কারা?

লোকটি বললে, মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর পাইক বরকন্দাজ এবং লেঠেল পালোয়ানের দল।

তার মানে?

লোকটি বললে, ওই দেখুন।

কি?

এই এদিকে, মানে পিছনে তাকান। হ্যাঁ। দেখছেন?

দেখছি। কিন্তু কি ব্যাপার? আলো, লোক।

হ্যাঁ। সব গয়েশ্বরী দেবীর লোক। আপনাকে নিতে এসেছে। আপনার কামরাটাকে তারাই মানে ওই লাইনের ওপাশের ওরাই দলবল নিয়ে জুটে ঠেলে ডিরেল্‌ড করে দিয়েছে। আপনি তো ভালোয় ভালোয় গেলেন না। এখন ওই সব লোকজন আসছে আপনাকে রিসেপশন দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বলেছিলাম তো—আপনাকে স্যার যেতেই হবে। দেখুন না ফার্স্টকেলাসের চাকার তলাতে ওরা দাঁত বের করে হাসছে। জন দু-তিন অবশ্য একটু জখম হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম দূরের আলোর শোভাযাত্রার দিকে। কি আলো? ঠিক তো হেজাক পেট্রোম্যাক্স অর্থাৎ কেরোসিন গ্যাসের আলো নয়। কেরোসিনে ভিজানো পলতের মুখে জ্বলা শিখা অথবা মশালের আলোয় যে ধরনের লালচে আলো জ্বলে মাথার উপরে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে, তা তো নয়। এমন আলো তো কখনও দেখিনি।

আলোগুলি কাছে এলে দেখলাম, সত্যই আলোগুলি বিচিত্র। একেবারে নতুন ব্যাপার। ব্যাপারটা বিজ্ঞানের জগতেও একরকম অভিনব। একটা লম্বা ডাণ্ডির ডগায় জোনাকি পোকার বড় বড় তাল যেন জমিয়ে রাখা হয়েছে, সে পঞ্চাশ ষাট হাজার না, লাখ লাখ, না সে যে কত, তা বলা খুব শক্ত। তবে হেজাক পেট্রোম্যাক্সের মতই উজ্জ্বল। অহরহ দীপ্‌ দীপ্‌ করছে। জোনাকিগুলো জ্বলে আর নেভে; সে হিসেবে মধ্যে মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু লক্ষ্য করে দেখে বুঝলাম, জোনাকিগুলোর অর্ধেকগুলো নিভছে এবং জ্বলন্তগুলো যখন নিভছে তখন নিভন্ত জোনাকিগুলো জ্বলে-উঠে আলোর মাপটা ঠিক বজায় রেখে যাচ্ছে। নিচের ডাণ্ডাগুলি ভারী সুদৃশ্য; একেবারে ধবধবে সাদা; কোন কিছু হাড় থেকে তৈরী মনে হল।

মনে মনে তারিফ না করে পারলাম না।

তেল লাগে না, পলতে লাগে না; এক লাখ কি পঞ্চাশ হাজার জোনাকি পোকা জমিয়ে খাসা আলো জেলেছে। আর আলোও হয়েছে বাহারের। সাবাস্ দিয়ে উঠলাম মনে মনে ঠিক সেই সময়টিতেই ঠক্ করে এমন একটা শব্দ উঠল যে চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম। ইনভ্যালিড চেয়ার বা স্ট্রেচারের মত একখানা সেডান চেয়ার নামালে তারা ঘাড় থেকে। এবং মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকরুনের সেই দূতপ্রবর সেই রকম দন্ত প্রকাশ করে বললে, চড়ে বসুন।

চড়ে বসব? কেন?

যেতে হবে না? গাড়ি ডিরেল করে আপনাকে নামিয়েছে। এরপরও আপনাকে ছেড়ে দেবে ভাবছেন? উঠুন উঠুন। বসুন চেয়ারে।

সেই জোনাকি-জমানো মশালের আলোয় এবং আকাশের জ্যোৎস্নার আলোয় লোকটার দাঁতগুলোকে আশ্চর্যরকম সাদা দেখাচ্ছিল এবং গায়ের মুখের রঙ ভীষণ রকম কালো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কালো রঙ-মাখানো কাগজে কেউ যেন সাদা কালি বা রং দিয়ে এমন হিজিবিজি কেটেছে যা দেখে সমস্ত শরীর কেমন যেন শিরশির করে।

ওদিকে তখন ট্রেনের প্যাসেঞ্জার এবং গার্ড ড্রাইভারেরা মিলে নানান জটলা শুরু করেছে, কি করবে এখন তারা? এই মাঠের মধ্যে এই রাত্রিকালে তারা আতান্তরে পড়েছে; কি করবে? কোথায় যাবে? যদি কোথাও না গিয়ে এইখানেই ট্রেনের কামরাতেই থাকে তাহলে কি খাবার মিলবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। হাজার রকম প্রশ্ন নিয়ে বেশ জোরালো তর্ক উঠেছে। তারই মধ্যে কানে এল, যেন ঐকতানে প্রশ্ন করছে, এই ভদ্রলোক? এই ভদ্রলোকের কি হবে? উনি কি এই মাঠের মধ্যে বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন?

কে যেন উত্তর দিলে—কপাল মশাই, কপাল! করবেন কি? আপনারই বা কি দোষ, অন্যেরই বা কি দোষ? এত লম্বা গাড়িখানার মধ্যে উনি একা ওই গাড়িতে চেপেছিলেন আর ওই গাড়িখানাই ডিরেল্‌ড্ হয়েছে। উনি জখম অজ্ঞান। আর আমাদের কর্মভোগ।

কথাগুলি আমার কি রকম যেন মনে হল। কারণ আমি একখানা বগিতে একা ছিলাম। ফার্স্টক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস বগিতে ছিলাম। আর সেই বগিখানাই তো উলটেছে। তাহলে? অজ্ঞানটা কে হল? আমি গয়েশ্বরী দেবীর সেই প্রগল্‌ভ দূতটিকে বললাম, কি হল মশাই? ওরা কার কথা বলছে? কে অজ্ঞান হয়ে গেছে? আমি ছাড়া আর কে একখানা বগিতে একা ছিল? দেখতে হবে যে! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

লোকটা বিচিত্র হেসে বললে, সে আর আপনাকে বুঝতেও হবে না দেখতেও হবে না। আর যা ভিড় করে ঘিরে রেখেছে, দেখছেন না! ও দেখা কি সহজ? তার চেয়ে আপনি ওই চেয়ারে উঠে বসুন।

উঠে বসব? কোথায়? কিসে? কেন?

বসবেন, ওই যে পালকি পাঠিয়েছেন আমাদের গিন্নীঠাকরুন ওই পালকিতে।

না মশায়, এই যুগে মানুষের কাঁধে চড়ে আর যেতে পারব না।

সে বললে, মহাশয়—এ আপনাদের গণতন্ত্র-চালিত এলাকা নহে। কাহারও দাবী এখানে চলে না। ভূতভাবন ভূতনাথের প্রতিনিধি ধর্মরাজ এখানকার ডিক্টেটর—তাঁর অধীনে এ অঞ্চল অর্থাৎ এই ছিট-ভুবনপুর গয়েশ্বরীর হুকুমে চালিত। এখানকার এই নিয়ম। এখানে মানুষের কাঁধেই যেতে হবে। বৈতরণী নদীর পলিমাটি, এখানে ঘোড়া চলে না, গাধা চলে না, এমন কি গোরু যে গোরুর ক্ষুর চেরা, সে গোরু পর্যন্ত চলে না। মোটর ফোটরের ফটর ফটরও এখানে চলে না। তা ছাড়া যস্মিন দেশে যদাচার। উঠুন।

ভারী খারাপ লাগছিল আমার। খানিকটা বেকায়দায় পড়েছি বলে কি লোকটা এই-ভাবে আমি হেন মানুষটার সঙ্গে এইভাবে কথা কইবে? আমি বিরক্ত হয়েই ডাকলাম, ও-রে-অ-অ-রা-মরে।

কেমন যেন মনে হল যে, ঠিক ডাকা হচ্ছে না। অ রাম রে—অরা-মরে অরা মরে হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে ট্রেনের পাশের জনতা প্রায় কলরব করে উঠল, কি বলছে। কি বলছে। ঠোঁট নড়ছে! ওই দেখ।—ওরা সকলেই প্যাসেঞ্জার।

এদিকে সেই উদ্ধত বেয়াদব গ্রাম্য অতি-সেকেলে লোকটি অর্থাৎ সেই মহিমার্ণবা শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী নাম্নী ছিট ভুবনপুরের পত্তনীদারনি প্রেরিত সেই গোমস্তা বা নায়েব বা সরকার বা উকিল জাতীয় সেই লোকটি বলে উঠল, ওরে, সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না রে! কিন্তু তুই বেটারা কি করছিস? এঁ্যা? দেরি হচ্ছে না?

সেই পঙ্গপাল বা ডেয়ো পিঁপড়ের দঙ্গলের মত সেই কালো কালো মূর্তির দঙ্গল থেকে একজন কে বললে, কি করব বলেন। হুকুম করেন।

কি হুকুম করব? যা নিয়ম তাই করবি।

যা নিয়ম?

আলবৎ।

বাস, পরমুহূর্তেই আচমকা সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিগুলির মধ্য থেকে, বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা দেখতে চার-চারজন লোক একসঙ্গে প্রায় ঝম্প প্রদান করে বেরিয়ে এসে আমায় মদগুর মৎস্য অর্থাৎ কিনা মাগুর মাছের মত খপ খপ করে চেপে ধরে এক মুহূর্তে কাবু করে ওদের সেই বিচিত্র পালকিখানার উপরে বসিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই গয়েশ্বরী-প্রতিভূ বলে উঠল, সাবাস্। উঠাও আব।

মুহূর্তে সেই বিচিত্র পাল্‌কিখানা প্রায় আটজন বেহারার কাঁধের উপর উঠিয়ে নিলে। আমি হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করার পর্যন্ত সময় পেলাম না। এবং সঙ্গে সঙ্গে কে একজন খুব কড়াগলায় মিলিটারী হুকুমের মতই হুকুম দিলে, আব চলো।

গয়েশ্বরী দেবীর সেই দূতটি হি-হি করে হেসে ভেড়া-ছাগলের মত গলায় বোধ করি আমাকে ঠাট্টা করেই গেয়ে উঠল, চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠরিয়া বহুতদূর যানা হৈ। দ্বিতীয়

লাইন লোকটা গাইলে, না গাইলে না, তা বুঝতে পারলাম না। তার কারণ সেই ডেয়ো পিঁপড়ের দঙ্গলের মত গয়েশ্বরী দেবীর পাঠানো কালো কালো সেই চ্যালা-চামুণ্ডার দল হালকালের নিয়ম বা ফ্যাসন অনুযায়ী ধ্বনি বা আওয়াজ দিয়ে উঠল—

গয়েশ্বরী দেবী কি—! —জয়!
ভূতেশ্বর জিউ কি! —জয়!
ছিট ভুবনপুর! —জিন্দাবাদ!

সে আকাশস্পর্শকরা ধ্বনি প্রতিধ্বনি। আকাশে বাতাসে ধ্বনিতরঙ্গ যেন অমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারের মত বিশ হাত উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দূরে দেখা যাচ্ছিল সেই রেল-লাইনটা; সেই অচল ট্রেনখানা; সেই লাইনের ধারে অন্য প্যাসেঞ্জারদের জটলা। তাদের জটলার কোলাহল কলরব এবং এঞ্জিনখানার স্টিমের শব্দ উঠেছিল। এই এদের সেই বিরাট ধ্বনিতরঙ্গ গিয়ে বিশ হাত উঁচু ঢেউয়ের মত সব কিছুকে যেন ভাসিয়ে বা ডুবিয়ে দিলে। আর আমি কিছু দেখতে পেলাম না বা শুনতেও পেলাম না। এদিকে তখন স্লোগানের পর স্লোগান উঠছে। তখন স্লোগান উঠছিল—

মধুর বদলে গুড়—।
চলবে না।
দুধ কমালে—
চলবে না।
বীচে কলা—
ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হ'ল না।

কপাল কুঁচকে প্রশ্ন জানিয়ে তাকালাম সেই গমস্তাবাবুর বা দেওয়ানবাবুর দিকে। সে আমার চোখের দৃষ্টি দেখে হেসে বললে, আজকাল পিণ্ডিতে আর মধু দিচ্ছে না পৃথিবীতে, কলা দিচ্ছে বীচে কলা আর পরিমাণেও কম দিচ্ছে তাই ওরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। আজ আবার তো গয়েশ্বরী ঠাকরুনের বাবার ছেরাদ্দ!

কিন্তু সে শোনার জন্যে আমার আর এতটুকু কৌতূহল রইল না। কারণ তখন সে এক বিচিত্র দৃশ্য সম্মুখে। যত দূর অনুমান সম্ভব সেই আশ্চর্য অজ্ঞাত বাজেভুবনপুরে, সেই অনুমানে মনে হল, সামনের দিকটা দক্ষিণ দিক—সে দক্ষিণ দিকে ঘন কালো অন্ধকার স্তূপের মত একটা কিছুর দিকে চলেছে সে এক বিরাট মিছিল।

একবারে সামনে সারি সারি আলো নিয়ে যেন মশালচীর দল চলেছে। তাদের মশাল-গুলোও সেই মশালের মত বিচিত্র, দপদপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে এবং নিভে নিভে যাচ্ছে।

তার পিছনে একদল চলছে সেই জোনাকি পোকার পিণ্ডের মশাল নিয়ে। এগুলো দিপদিপ করছে বটে কিন্তু একেবারে নিভে যাচ্ছে না। কারণ এ নিভছে ও জ্বলছে। ও জ্বলছে এ নিভছে। তাতে মোটমাট আলোর পরিমাণ ঠিক এবং স্থির আছে। তাদের সেই আলোতেই একসময় মনে হল, সামনের নিভন্ত জ্বলন্ত আলোকধারী যারা তারা

সকলেই মেয়েছেলে।

আরও মেয়ের দল রয়েছে, তারা জোনাকি মশালধারীদের ঠিক পিছনে রয়েছে। তাদের দেখে কিন্তু আমার শরীর শিউরে উঠল। ও বাপ। এরা কারা।

ঢলকো-করে সর্বাঙ্গ ঢেকে কাপড়পরা একদল লোক, বোধ হল তারা সকলেই মেয়ে। তাদের পিছনেই ছিল জোনাকি পোকায় তৈরী সেই আশ্চর্য মশাল, তার আলোয় তাদের স্পষ্ট দেখেছিলাম। যা দেখলাম, তাতে আশ্চর্য হলাম এই কারণে যে, তাদের সেই নিভন্ত-জলন্ত মশালগুলো তারা হাতে ধরে নেই; আলোগুলো যেন তারা মাথায় করে নিয়ে চলেছে। ভারী বিচিত্র মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আপাদমস্তক ওয়াড়পরা একদল চলন্ত পাশবালিশ।

তাদের দলের পরেই তো বলেছি জোনাকি-মশালধারীর দল। তাদেরও দেখে খুব বিচিত্র মনে হচ্ছিল, কারণ লোকগুলোর গায়ের রং অত্যন্ত বিশ্রী রকমের সাদা বা লাল্‌চে, দেখে যেন শরীর শিউরে ওঠে। গা গুলিয়ে যায়। ভয় করে। লক্ষ্য করলাম এদের কাপড়গুলো সব কালো। মেয়েপুরুষ দুই রয়েছে।

তাদের পিছনে যারা, তারা পোড়া বাঁশের মত লম্বা এবং কালো। ও—মা। এযে সব মেয়েছেলে! এই লম্বা। আর আশ্চর্য কালো। তেমনি সরু শীর্ণ চেহারা। পরনের কাপড়েরও কি তেমনি বাহার। হাঁটুর বেশি ঢাকেনি। মনে হল ইচ্ছে করেই খাটো করে পরেছে। উপরের শরীরটাকে কিন্তু আচ্ছা টাইট করে ঘিরে কোমরে ফেরতা বন্ধনে বেঁধেছে। বাঁ কাঁখে একটা চ্যাঙারি বা ডালা বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ধরে রেখেছে। ডান হাতটা ওদের চলনের সঙ্গে বেশ তালে তালে দুলছে। মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকাচ্ছিল তারা। সঙ্গে সঙ্গে ফিক ফিক করে হাসছিল। ভারী বাহার খুলেছিল তাতে। সেই আশ্চর্য কালো কালো মুখে, সাদা সাদা চোখ এবং ঝকঝকে দু-দুপাটি দাঁত ঝকমক ঝকমক করছিল। মনে হচ্ছিল কোন আলকাতরা মাখানো দেওয়ালে সাদা চুন ছিটিয়ে দিচ্ছে কেউ।

এই মেয়েরা মধ্যে মধ্যে ডানহাত দিয়ে বাঁ-কাঁখের ডালাটা থেকে মুঠো ভরে সাদা (খুব বেশি সাদা নয়) কিছু নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। মনে হল শুকনো ফুলের পাপড়ি টাপড়ি হবে।

তারপরই ছায়ামূর্তির-মত-মানুষের সমুদ্র বললে বেশি বলা হবে না। ছায়ামূর্তির মানুষ মানুষ আর মানুষ। ও। সে যে কত তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। আর কত রকমের কত চেহারার কত পোশাকের। বেঁটে লম্বা মোটা সরু, চুলভরা মাথা, টাকভরা মাথা, দাড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখ, শুধু গোঁফওলা মুখ, দাড়ি-গোঁফ চাঁচা অর্থাৎ কামানো মুখ, সে যে কত রকমের সে কি বলব। আমি এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সবই প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। মোটমাট বেশ লাগছিল। এ রকম প্রসেসন করে কোন কাজে কেউ তো আমাকে নিয়ে যাবে না। সুতরাং বেশ লাগবে না তো কি।

ছায়ামূর্তির মত মানুষদের মিছিলের সেই বারোভাজা বা পাঁচমিশেলী চানাচুরের মত অংশটার পর যে অংশটা সেই অংশটার দিকে তাকালাম। এরা কারা?

ছোট ছোট নানান চেহারা এবং নানান পোশাক-পরা দল।

ভালোভাবে বেশ ঠাওর করে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তখন আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে; অন্ধকার ঘন হয়েছে; ওদের হাতের জোনাকিমশালের আলোতেও সে অন্ধকার ফিকে করতে পারছিল না। বেশ ঠাওর করে দেখলে তবে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন বজ্রগম্ভীর তবে কিছুটা অনুনাসিক কণ্ঠে হেঁকে উঠল—হু—কুম—দার। হল্ট্।

সম্মুখে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ফটক। বিরাট বা বিশালকায়—ইয়া পঞ্চাশ-পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাতি, পঞ্চান্ন-ষাট ইঞ্চি ভুঁড়ি, বিশ-বাইশ ইঞ্চি গর্দান আর এই মালসার মত মাথা ছ'ফুট লম্বা সশস্ত্র প্রহরীরা সে-ফটক রক্ষা করছে। তারাই কেউ এমন পিলে-চমকানো হাঁক মেরেছে! তাদের মুখের উপর প্রখম মাথায় আলোবহনকারীদের আলো পড়ছিল; সেই আলোয় দেখলাম, ইয়া গোঁফ এই গালপাট্টা, চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা, জ্বলজ্বল করছে,

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড জোরালো গলায় কে হাঁক দিয়ে উঠল।

—হল্ট—হু কম দার—। রোখো কোন আতা হ্যায়। মনে হল যেন বাজ ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মিছিল। চমকে উঠে থেমে গেল। আমিও চমকে উঠলাম।

উত্তর দিলে গয়েশ্বরীর সেই দূত। সে বলে উঠল, গিন্নী-ঠাকরুনের বাবার ছান্দে বক্তৃতা করবার গুণীজন। মর্ত্যভূমসে আয়া। ফিন ঘুম যায়েগা। ছোড়ো, ফটক ছোড়ো।

ই সব লোক কৌন—কাহে চিল্লাতা?

তুম কচু পোড়া খাও। যম রাজার রসকস-হীন গুণ্ডাভূতের দল তো। আরে বাবা—এ সব হল দেখাবার জন্যে জলুস। সেই ফাঁকে বেটারা মনের সাধে চেঁচিয়ে নিচ্ছে।

এবার উত্তর হল, বরঞ্চ হুকুম হল বলাই ভাল, হুকুম হল, বহুত আচ্ছা! আস্তে আস্তে চিল্লাও, হুড়মুড় করকে মৎ যাও, জলদি জলদি যাও। লিকিন বোল্ বোলকে যাও কোন কোন যাতা হ্যায়। পাসপোর্ট নিকালো, চলো চলো চলো। বলো কৌন যাতা?

খোনা মেয়েলী গলায় আওয়াজ হল—

আমরা যাচ্ছি 'পেত্তারা' মানে আলেয়ারা। সাদা রঙ আমাদের।

আচ্ছা। আচ্ছা। মাইয়ালোক সব। ঠিক হ্যায়। উসকে বাদ? কোন যাতা।

আমরা জোনাকি মশালচী। ছিঁচকেপোড়া পেরেত।

হাঁ হাঁ। তুম লোক ভি আগুনে পুড়েমরা প্রেত। সব সাদা তো?

হাঁ।

চলে যাও। উসকে বাদ?

আমরা গো।

কারা তোমরা, বাতাও।

মরণ। মিন্‌সেদের ঢঙ দেখ। চেহারা দেখে চিনতে পারে না। পোড়া বাঁশের মত লম্বা, খাটো করে কাপড় পরেছি, কাঁখালে ডালা রয়েছে, মুঠো মুঠো মাছের আঁশ ছিটুচ্ছি—আমরা কারা জিজ্ঞেস করছে? পুকুরে পুকুরে শামুকগুগলি তুলি। বারোমাস তিরিশ দিন

দেখছে তবু বলবে কারা তোমরা বাতাও।

আরে এতনা বাত মাৎ বোলনা। বলো কোন লোক তুমলোক।

শাঁমুক তুলি—শাঁখচুন্নি—

ঠিক হ্যায়, ভিতর যাও। আর কোন লোক? আলেয়া পেত্‌তা; ছিঁচকেপোড়া; শাঁকচুন্নী। আউর কোন?

একসঙ্গে কারা বলে উঠল, অহম আবাং বয়ম্।

সসম্ভ্রমে এবার দ্বারপালেরা বললে, আরে বাপরে। বরম-দেও লোক। —গোড় লাগি মহারাজ।

জিতা রহো। চিরং জীব। ভূত হয়ে চিরকাল বেঁচে থাক।

ওঁরা চলে গেলেন। খটাস খটাস শব্দে খড়ম বেজে চলে গেল। এর পর?—এর পরই দ্বারপালেরা এ্যাটেনশন হয়ে খড়াস শব্দ তুলে স্যালিউট করে হেঁকে উঠল—জিন্দাবাদ।

যে নামে জিন্দাবাদ দিলে, তা মনে মনেও উচ্চারণ করতে পারলাম না। নিদারুণ ভয় হল। তিনি কিন্তু সেই মুহূর্তে ফটকের ওপাশ থেকে বেশ অভিজাত ভৌতিক অর্থাৎ খোনা গলায় আমাকেই সম্ভাষণ করলেন, সুস্বাগতম্—হেঁ যঁম দত্ত-বন্ধু অঁমরতাঁ প্রঁত্যাশী-মঁহাশয়; সুস্বাগতম্—এই ভূত প্রেত পিশাচাদিদিগের আশ্রয়ভূমি, এই বৈতরণী নদীতটস্থিত খেয়াঘাট-কেন্দ্রিক বন্দর নগরে ও তৎসংলগ্ন চরভূমিতে। মহাশয় আপনি আমাদিগের সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদের কাহারও সন্ধান আজ মর্ত্য-ভুবনপুরের কুত্রাপি প্রাপ্ত হন নাই। যাহার ফলে আপনি আমাদিগের সম্পর্কে এই নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আমরা মিথ্যা, আমরা ঝাড়েবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছি; এমন কি আমরা চিরকালই মিথ্যা অলীক, কোন কালেই আমাদের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া ধারণা হইতেছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আপনি মায়াবাদ-তুল্য কোন নবীন 'বাদ' সৃষ্টির কথাও চিন্তা করিতেছেন। এ সকল সংবাদই আমাদের এই ছিট ভুবনপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা আমাদিগকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান কাল ও মনুষ্যকুল এই দুই পক্ষ এক গোপন চুক্তিবদ্ধ হইয়া ভূতকাল ভূতলোক ও ভূতজাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যাহার লক্ষ্যই হইল ভূতজাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া। ইওরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতে যেমন কতিপয় ডিক্‌টেটর এবং দল একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল, চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক। তাহারা উহা যথাসাধ্য গোপনে করিয়াছিল কিন্তু সমগ্র মনুষ্যকুল আজ দল বাঁধিয়া জোট পাকাইয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযান শুরু করিয়াছে। আজ আপনি আপনাদিগের অর্থাৎ বর্তমান মনুষ্যকুলের দোষত্রুটি দেখিলেন না; কোন ব্যাপক অনুসন্ধান করিলেন না; একেবারে নিজের খামখেয়াল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিলেন, ভূত ছিল না ভূত নাই ভূত মিথ্যা। মহাশয় নিতান্তই বুদ্ধিতে গর্দভ তাহা বলিব না, বলিতেছি, এযুগের সংস্পর্শদোষে বুদ্ধি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে নিরতিশয় প্রশংসা-লোভে প্রায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। টেলিগ্রাম করিয়া

কলিকাতায় মিটিং ডাকিতে বলিয়াছেন। মতলব সেখানে ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আপনি দাঁড়াইয়া বুক বাজাইয়া চিৎকার করিবেন, ভূত নাই ভূত মিথ্যা।

আপনার চেলারা হাঁকিবে—ভূত
লোকেরা বলিবে—মুর্দাবাদ। বিলকুল ঝুট।
আপনি বলিবেন—মানুষ
তাহারা বলিবে—জিন্দাবাদ। সত্‌হায়।

কিন্তু মহাশয়, তাহা এত সহজ নহে। এত সোজাও নহে। শুধু ভূতেরা মরিবে আর মানুষেরা বাঁচিবে তাহা হইতে পারে না। আমরা তাহা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া ফেলিয়াছিলাম। মনুষ্যলোকে ধ্বনি-তরঙ্গবাহিত শব্দবাক্য রেডিও নামক যন্ত্র দ্বারা ধরিতে হয়; ভূতলোকে তাহার প্রয়োজন হয় না। ভূতেরা সব আপনা-আপনিই জানিতে পারে। তাহারা আপনার এই সিদ্ধান্ত ও ভূত-বিরোধী অভিযান-পরিকল্পনা আপনা আপনি জানিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছে, আমাদের ছেলেপুলেদের দল তো বেশ চটিয়াছে। কিন্তু ভূত ভুবনপুর ও মর্ত্যভুবনপুর এখন বর্তমানকাল ও ভূতকালের বিবাদবশতঃ বৈদেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং হালফিলের কয়েকটা বৈজ্ঞানিক খনি আবিষ্কারের দৌলতে রাতারাতি-ধনী মর্ত্যভুবনপুর একেবারে সর্পের পঞ্চপদ নিরীক্ষণ করিয়া নিজেকে অজেয় মনে করিয়াছে ও উভয় ভুবনপুরের সীমান্ত-বরাবর অত্যন্ত কড়া পাহারা বসাইয়াছে। ভূত ভুবনপুরের কোন লোককে ধরিতে পারিলেই বোতলে পুরিয়া মুখে ছিপি আঁটিয়া আলমারি কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখিতেছে। অন্যথায় সংবাদ পাইবামাত্র তাহারা ভূত ভুবনপুরের তিন্তিড়িবৃক্ষ বা শাল্মলী বৃক্ষ বা শিংশপা বৃক্ষ বা অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শীর্ষদেশ হইতে এক ঝম্পে বা লম্ফে তদীয় গ্রামের বৃক্ষশীর্ষে ঝড় তুলিয়া নামিত। এবং সেখান হইতে সড়াক করিয়া মাটিতে নামিয়া ভবদীয় গৃহকে ঘেরাও করিয়া নৃত্য করিত ও উপদ্রব করিত। গাছপালা নাড়া দিত, ধুলা ছিটাইত, ঢেলা মারিত, কেহ কেহ দুঃসাহসী হয় তো আপনার চুল ধরিয়া টানিত, কেহ বা আপনার সম্মুখে দাঁত বাহির করিয়া আপনাকে মুখ ভেঙাইত। হয় তো কেহ কেহ চাঁটিও মারিতে পারিত। হঠাৎ পা ধরিয়া টানিয়া উলটাইয়া ফেলিয়া দিলেও কিছু বলিবার ছিল না। ইহা ছাড়া খোনা গলায় চিৎকার করিয়া রাত্রির আকাশ জুড়িয়া হিজিবিজি কাটিয়া বিশ্রী করিয়া দিত।

শুধু পাসপোর্টের অনিয়মের জন্য তাহা হয় নাই। ভূতদিগকে কোনক্রমেই পাসপোর্ট দিতে মর্ত্যভুবনপুরের বর্তমান পরলোক-অবিশ্বাসী, ধর্মে আস্থাহীন বুদ্ধিনৈতিক ও বিদ্যানৈতিক কর্ণধারগণ একেবারেই নারাজ। ভূতদিগের দিক হইতেই তাহাদের বিপদাশঙ্কা। ভূতেরা একবার প্রবেশাধিকার পাইলে, তাহাদের আশঙ্কা, মর্ত্যভুবনপুরে তাহাদের পার্টি-রাজত্বের দফা খতম হইয়া যাইবে। তাহারা একটা আশ্চর্য পদ্ধতি ও একটা আশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে যাহার বলে তাহারা ভূতদের ধরিয়া বোতলে পুরিয়া এক ফোঁটা ওষুধ প্রয়োগ করিলেই ভূতেরা গ্যাস হইয়া যায় এবং অসীম শূন্যের গ্যাসস্তরের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আমরাও অনেক কিছু পারি, আজ আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি আপনাকে

ঘিরিয়া আমরা ধেই ধেই করিয়া নাচিতে পারি; আপনাকে নাচাইতে পারি। ভয় দেখাইতেও পারি।

মহাশয়, আপনি এখন অশরীরী সত্তায় আমাদের সঙ্গে এখানে রহিয়াছেন। আপনার সংজ্ঞাহীন দেহ রেললাইনের ধারে গাছতলায় নিথরভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা এখানে আপনাকে ভয় দেখাইলে যন্ত্রণা দিলে আপনার দেহখানা সেখানে গোঁ গোঁ করিবে হাত পা ছুঁড়িবে তাহা এখনি দেখাইতে পারি। দেখাইতে পারি কেন, এখনই দেখাইয়া দিতেছি। আর আপনি যদি মরিয়া যান তাহা হইলে আপনাকে আমরা এখনই বৈতরণীঘাটে পাঠাইয়া দিব, আপনি সেখানকার কোন বৃক্ষরূপী হোটেলে থাকিবেন। আপনার জন্য সীট বা বার্থ ইত্যাদির ব্যবস্থা হইলে স্টীমারে চড়িয়া বা নৌকায় চড়িয়া ওপারে যাইবেন। সে হইলে আপনাকে আমরা সহজে ছাড়িব না। হয় আপনাকে ওই মর্ত্যভুবনপুরে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিব আপনি ওই বিজ্ঞানী-নামক চরম অজ্ঞানীদের হাতে পড়িয়া ওই ঔষধের ফোঁটার গুণে গ্যাস হইয়া ফুস্ শব্দ করিয়া মিলাইয়া যাইবেন। অনন্তকাল ইথারের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিবেন। নয় তো আমরাই আপনাকে ধরিব এবং ভূতলোকে ভূত-অস্তিত্বে অবিশ্বাসের অপরাধে সিকিউরিটি অ্যাক্টে আটক করিয়া ব্রেন ওয়াশ করিতে থাকিব। এবম্প্রকার ঔদ্ধত্য আর আমরা কোনপ্রকারেই বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহি। ভূতগণ—

উত্তরে, সে বোধ হয় কয়েক হাজার তরুণ ভূত, খোনা গলায় সাড়া দিয়ে উঠল।

হুঁ। হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।

সে যেন শীতের গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একসঙ্গে কয়েক হাজার কুকুর কি শিয়ালের ছানা একসঙ্গে কুঁই কুঁই করে উঠল।

সে খোনা কুঁই কুঁই শব্দের প্রতিধ্বনিতে আমারও যেন দারুণ ভয়ে কান্না পেয়ে গেল। ভাবলাম হাত জোড় করে আমিও খোনা আওয়াজে বলে উঠি, মাঁপ কঁরুন ভূঁত প্রঁভুরা আঁমাকে মাঁপ করুন। আঁমার দোঁষ হঁয়েছে। কেঁ বঁললে আঁমি ভূঁতে অঁবিশ্বাস কঁরি? ওঁটা কেঁবল লোঁক দেঁখানো। আঁমার মঁস্তিষ্কের মধ্যে অঁশরীরী হঁয়ে তুঁমি লুঁকিয়ে আঁছ। আমার খাতার পাতায় আঁকা ছঁবির মঁধ্যে আঁছ। ঘঁরের অঁন্ধকার কোঁণে ও মঁনের মধ্যে তুঁমি নঁড়ে ওঁঠো।

বলতে চাইলাম কিন্তু বলতে পারলাম না। ভয়ে কোন আওয়াজ আমার গলা থেকে বের হল না। শুধু হাজার হাজার তরুণ ভূতেদের খোনা আওয়াজের চন্দ্রবিন্দুগুলো খোল করতাল বাজিয়ে আস্ফালন করতে লাগল।

আমি দৃষ্টি যথাসাধ্য বিস্ফারিত করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের মত অন্ধকারের মধ্যে নিকষকালো লম্বা লম্বা কাঠির মত এক ধরনের প্রাণী নিশ্চয়। কাঠির মত হাত কাঠির মত পা, একটু মোটা কাঠির মত বুক পেট, একটা আলুর মত মুণ্ড তাতে দুটো ব্যাঙের মত ড্যাবডেবে চোখ আর শোলার তৈরী মুলোর মত দাঁত। সব যেন কিলবিল করছে চারিদিকে।

হঠাৎ এরই মাঝখানে কোন একজন ভারিক্কি মহিলার বাজখাঁই কণ্ঠধ্বনি সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল—চুঁ—প্—।

হ্যাঁ। সে এক চুপের মত চুপ বটে। চএ হ্রস্ব উকার দিয়ে চু নয়—দীর্ঘ উকার দিয়ে চূ, তাও একটা দীর্ঘ উকার না, অন্ততঃ তিন তিনটে দীর্ঘ উ লাগিয়ে কোন লাউডস্পীকার মুখে লাগিয়ে হাঁক হেঁকেছেন হাঁকদায়িনী বা হাঁকিনী।

আচ্ছা জবরদস্ত হাঁক। সে যেন কানের কাছে সাইরেন বেজে গেল। এবার আমি ভয় পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের মত খোনা আওয়াজের 'চু—প' শব্দটা কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ ভূতের খোনা-আওয়াজের বিশাল স্তূপটা বা পাহাড়টা একেবারে 'চিচিং ফাঁকের' মত মন্ত্রবলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। এবং নিশ্চুপ নিস্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। আমি দেখলাম কাঠিজুড়ে গড়া ভূতগুলো ক্রমশঃ যেন বড় এবং মোটা হয়ে উঠছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের মুখ চোখের মাধুরী দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

আবার সেই জাঁদরেল নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল। খাঁম বলছি বজ্জাত ব্যাটারা। হাঁরামজাদা উল্লুকরা। খাঁম বলছি খাঁম। থেমে আগেই গিয়েছিল সকলে, এখন সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম ছায়াছায়া মূর্তিধারী ভূতেদের ভূত-জনতা দুপাশে ফাঁক হয়ে গেল এবং তার মধ্য দিয়ে জোনাকিপোকার পিদিম হাতে একজন সম্ভবতঃ ঝিয়ের পিছনে এক বিপুলা মহিলা। এই মোটা এই মাথা, সে মাথার চুলগুলো প্রায় সব উঠেই গিয়েছে, যে কটা আছে সে কটা লম্বায় আধহাত আর গুণতিতে একশো গাছাও হবে না। মনে হল নিরেনব্বুই গাছা, তাতে একটা গিঁঠ বাঁধা। গলায় পাটী হার, হাতে তাগা, হাত দুটো এই মোটা, হাতের বাঈ দুটোতে মাংস থলথল করছে। গালেও তাই, দাঁত ভেঙে পড়েছে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, দুহাতে দুই হাঁটুর কাছ বরাবর কাপড় সামলে ধরে থপাস থপাস করে হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে এসে হাজির হলেন এবং দাঁড়ালেন আমার সামনে। পানজরদা খাওয়া দুপাটি তরমুজের বিচির মত দাঁত মেলে বললেন, এস এস। এ বেটারা বাবা সব ছুঁচোর দল গো। হাল আমলের লোক। মানীর মান জানে না। তারপরে? রাস্তাতে কোন কষ্টটষ্ট হয়নি তো? সব ভূতের দল তো? জান বাবা ভূত হলেই কেমন একটা হালকা পলকা ফাজিল-ফাজিল চেহারা হয় মনের। হায় হায় বাবা তোমাকে একথা তো বলতে পারছি না যে, বাবা তুমি এবার ভূত হয়েছ, এবার তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে। তুমি এখনও মরনি। অজ্ঞান হয়ে আছ। সেটা আমাদের চক্রান্তেই বটে। তা তার জন্তে দায় তোমার। বুঝেছ। তুমি তোমার গাঁ থেকে টেলিগিরাপ করলে, মিটিং ডাক ভূত নাই ভূত মিথ্যে পেমান করে দেব। তারের 'টরে টক্কা' আমাদের এরা আজকাল ধরছে বাবা। ধরা আপনি পড়ে। আগে গেরাহ্যি করতাম না এখন গেরাহ্যি না করে উপায় নাই। মর্ত্য-ভুবনপুর আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বিলকুল তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা করি কি? দেশ ভাগ করে বৈতরণীর ঘাটের কাছে এই খানিকটা দেশ দিয়েছে তাতেই আমরা গাদাগাদি করে বাস করছি। এখন দাঁড়াও বাবা দুটো পান খেয়ে নি। ওলো

দামিনী। গেলি কোথায়? হারামজাদী পেত্নী কোথাকার। দে পান দোক্তা দে।

দামিনী পেত্নী ঝি সঙ্গে সঙ্গে পানের বাটা খুলে ধরলে এবং কৃতকৃতার্থ হয়েছে এই ধরনের আকর্ণবিস্তার হাসি হেসে দুটো সাংঘাতিক দাঁত বের করে আমার দিকে তাকালে।

ঠাকরুণটি দুটো পান একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে বাঁ হাতে দামিনীর গালে একটা ঠোনা মেরে দিয়ে বললে, মরণ, হারামজাদীর নোলা দেখ। জ্যান্ত মানুষের গন্ধ পেলে হয়। জিভ লকলক করে। ওই বাঁকা দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়ে। জানো বাবা হারামজাদী রক্তচোষা বাদুড় হয়ে রাত্রে সে কালে মনিষ্যি-রাজ্যে ঘুরত। ওই দাঁত দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের রক্ত চুষে খেতো। বেটীর পাখা কেটে দিয়ে তবে শায়েস্তা করেছি, বেটী বদমাসের একশেষ। একে নিয়ে পেরেত লোকের পেরেত রোমাঞ্চ কাগজে একটা যা গপ্প নিকেছে না একজন নিকিয়ে-ভূত, সে পড়ে দেখলে বুঝতে দামিনী কি চীজ্।

দামিনী মাথায় এই এতখানি ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে, হেই মা গো! এই সব নজ্জার কথা নাকি ভিনদেশী লোকের কাছে বলতে হয় গিন্নীমা। কি নজ্জা। কি নজ্জা।

গিন্নীমা, সেই বিপুলকায়া সেই মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী তখন একচামচ জরদা মুখে পুরে দামিনীর মাথার চুল ধরে টান মেরে বললে, চোঁপ হারামজাঁদী চোঁপ।

ঠিক এই সময় একজন ভীমকান্তি দিব্য চমৎকার মিলিটারী মিলিটারী পোশাক-পরা লোক এসে দাঁড়াল—তার এক হাতে একটা লম্বা দড়ি অন্য হাতে একটা গদা। এবং এক নতুন রকম মিলিটারী স্যালুট করে বললে, মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী দেবী।—তার ইয়া গোঁফ, ইয়া গাল-পাট্টা দেখে ভয় হল আমার।

গয়েশ্বরী দেবী মুখ বেঁকিয়ে পচ করে একমুখ পানের পিচ ফেলে বললেন, কি বাওয়া জোমডুট। কি বলসো মানিক?

লোকটি বললে, মর্ত্যভুবনপুরে এ লোকটির সংজ্ঞাহীন দেহে ইনজেকসন দিচ্ছে সেবা-শুশ্রূষা করছে, তার ফলে একে ফিরে যেতে হবে সেখানে। অতএব একে নিয়ে আর কি কাজ আছে তা শেষ করে নিতে বলছি। আর বেশিক্ষণ ওকে রাখার আদেশ মিলবে না।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা! তাহলে এই ভূতগুলোকে একটু ধমকে টমকে দাও। তা নইলে তো ওরা ছাড়বে না। বেশ বুঝতে পারছি ওরা একটা হাঙ্গামা বাধাবার তালে আছে বাবুটির সঙ্গে। দেখ না কেমন করে ভিড় করেছে দেখ না।

যমরাজকে ১৪৪ ধারাকে হুকুমতসে স—ব-হ—ট যাও—স—ব হট যাও, বলে হাঁক মেরে পাহারাওয়ালা হাতের দণ্ডটা ঘুরিয়ে দিয়ে কটমট করে সকলের দিকে তাকালে। নাকটা ফুলে উঠল তার। গোঁফ দুটো নড়তে লাগল দাঁড়িপাল্লার দাঁড়ির মত।

ভূতগুলো, হ্যাঁ গয়েশ্বরী দেবী আমাকে বলেছিলেন, তারা বিদ্রোহী এবং মনুষ্যগণের উপর ক্রুদ্ধ ভূত। গয়েশ্বরী দেবীর উপরও ক্রুদ্ধ বটে তারা।

এবার আমার অবাক হবার পালা। অন্ততঃ তাই মনে হল আমার। কারণ যা ঘটল তা অভাবনীয়। এই সব বিদ্রোহী লম্ফ ঝম্ফ এবং মুষ্টি-ছোঁড়া ভূতের দল এক মুহূর্তে ছুটতে

লাগল। মানে পালাতে লাগল। মনে হল গড়ের মাঠে ফুটবলের ম্যাচের আসরে সেপাইরা করেছে দর্শকদের তাড়া আর তারা পালাচ্ছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা, তারা শুধু বিদ্রোহী নয়, তারা ভূত বিদ্রোহী, তারা ওই একটা পাহারাওয়ালার ভয়ে এমনি করে পালিয়ে গেল। ভূতের এত ভয়। ও কে?—ভূতেরা এত ভয় করে।

দুই হাতে দুই হাঁটুর পাশের কাপড় মুঠোয় ধরে একটু তুলে অনেক কষ্টে পা তুলে থপ করে ফেলে বললেন সেই মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী দেবী; বললেন, ওরা হল যমদূত বাবা। ওই ওরা আছে বলেই এখানে কাজটাজগুলি বিলিব্যবস্থামত এখনও চলছে। না হলে এত দিনে লণ্ডভণ্ড করে দিত। এই ভূতেরাই দিত, কিছু মনে করো না বাবা, এ সবই তো তোমাদের কাজ বাবা। মানুষেরাই তো এর জন্ত কোমর বেঁধেছে। কিছু কি রাখত। ভগবানকে তো মানুষেরাই উড়িয়ে দিয়েছে। ভয়কে মেরেছে। পারেনি কেবল মরণের মালিক যমকে। ওকে তো মারতে পারেনি। ছিষ্টিকে তো এখনও ওই একজনাই রেখেছে। ভাগ্যে মানুষ মরে। আর যমদূতেরা ভূতকে ছুঁলেই ভূতগুলো হয় খরগোশ ছাগল, আর যমদূতে হয়ে যায় বাঘ।

আমি যমদূতটার দিকে তাকালাম। ওঃ লোকটা কি ভয়ানক রকমের ভয়ানক। বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠল। মনে মনে আমি যেন খরগোশ হয়ে যাচ্ছিলাম ভয়ে। ইচ্ছে হচ্ছিল, তিড়িং করে একটা লাফ মেরে পালিয়ে যাই। কিন্তু তাও সাহস হল না।

গয়েশ্বরী বললেন, এস বাবা এস। তোমার আর বেশি টাইম নাই। তোমাকে এর মধ্যে যতটা পারি দেখিয়ে দি। এস।

* * *

গয়েশ্বরী দেবীর পিতৃশ্রাদ্ধের আসরে গেলাম। দেখলাম গান হচ্ছে। গণ্ডছন্দের গান।

"ওগো গয়েশ্বরী দেবী গো, ভূত-ভুবনপুরের পত্তনীদারনী গো, তোমার পুণ্যবান পিতা প্রেত-শিলার জবরদখলকার অপঘাতে মরা গুণ্ডা প্রেতদলের ডিক্‌টেটর মরিলেন গো—। শত শত বৎসর প্রেতনৃত্য, মহা দৌরাত্ম্য চালাইয়া অবশেষে মরিলেন গো। অশরীর প্রেতদেহ ত্যাগ করিয়া তোমার মহাপুণ্যবান এবং মহাবিক্রমশালী গুণ্ডা পিতা পুণ্যসলিলা বৈতরণীর জলে স্নান করিয়া সর্বাঙ্গে জয় জয় জয় হোসেন, জয় শাহ, জয় জয় জয় জিন জয় তুষ, ইত্যাদি নাম অঙ্গে লিখিয়া ও মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে ওই তিনি মর্ত্যভুবনপুরের দিকে চলিয়াছেন গো। ওই তাঁহার জন্ত বিধাতার দূত আসিল গো। কিন্তু পুণ্যবাণ তোমার পিতা বিধাতার দূতের সঙ্গে কথা কহিলেন না। তিনি স্বর্গে যাইবেন না। তিনি মর্ত্যে যাইবেন। মর্ত্যের তুল্য ধাম নাই। এবং সৃষ্টিতে মনুষ্যলোকের রাজাদের প্রেসিডেন্টদের বা নেতাদের তুল্য নাম নাই। হরিনাম, দশরথ রাজার বেটার নাম, ওসব নাম যে পুণ্যফল দেয় তাহা সব ভুয়া, তাহাতে পোকা ধরিয়াছে। তাহা অপেক্ষা মর্ত্য-ধামের মাকাল ফলের অনেক উৎকৃষ্টতর স্বাদ এবং অনেক রকম ভিটামিন সমৃদ্ধ। মর্ত্যধামে তিনি চলিলেন। তাহাতে ভূত প্রেতদের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের অধিকার পুনঃ-

প্রতিষ্ঠিত হইবে। ওই শুন শুন মর্ত্যধামে টিন বাজিতেছে, ক্যানেস্তারা বাজিতেছে, ওই দেখ মর্ত্যধামে তাঁহাকে আবাহনের জন্য হই-হুল্লোড় ধ্বনিত হইতেছে।"

কয়েকজন লম্বা ধরনের ভূত ঘটির মধ্যে লোহার একটা চাবি বা ডাণ্ডি বাজিয়ে ওই কথা-গুলো একসঙ্গে সুর মিলিয়ে গানের সুরে বলে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম এরা এখানকার ঘটি বাজিয়ে তন্তীরাম বামুনের দল! ওইভাবে মৃত ভূতের পারলৌকিক সদ্‌গতির কথা বর্ণনা করছে কেবল মাত্র পাওনাগণ্ডা আদায়ের জন্য। ঠিক মর্ত্যভুবনপুরেও এমনই করে তন্তীরাম বামুনেরা। টাকা দিলে ওরা মৃতজনকে ইন্দ্রলোকে পাঠায়, ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুলোকে শিবলোকে কৈলাসে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দেয়। আর না পেলে নরকে পাঠায়। গালাগাল করে। ওই টাকা ওই টাকা বলে চিৎকারও করে। সবই হয়ত বাজে কিন্তু একটা খটকা লাগল। বলছে "মরিয়া তিনি সুখের মর্ত্যধামে যাইতেছেন। তিনি আম খাইবেন জাম খাইবেন শশা খাইবেন ভাত খাইবেন ডাল খাইবেন কাটলেট খাইবেন চপ খাইবেন মামলেট খাইবেন। আরও কত কি খাইবেন। তিনি চোঙা প্যান্ট পরিবেন ভূত প্রেত আঁকা জামা পরিবেন, সিগারেট খাইবেন, বিড়ি খাইবেন ধেই ধেই করিয়া নাচিবেন, ট্রাম পোড়াইবেন, বাস পোড়াইবেন, হিপি হইবেন, হাংরি হইবেন, অ্যাংরি হইবেন আরও কত কি হইবেন।"

এ সব কেন বলছে?

মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল, কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। বারবার নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মানে কি? গয়েশ্বরী দেবীর বাবা মরলেন। তারই বা মানে কি? গয়েশ্বরী দেবীর বাবা আগে মানুষ ছিলেন। মানুষ হয়ে জন্মালে মানুষকে মরতে হয়, মানুষ অমর নয়। মরে মানুষ ক'দিনের জন্যে প্রেত থাকে—তারপর শ্রাদ্ধ হয়ে গেলেই সে চলে যায় যেখানে যাবার। স্বর্গের এ-লোক ও-লোক সে-লোক—সে গোলোক থেকে শিবলোক পর্যন্ত অনেক লোক আছে। এর উলটো দিকে আছে নরক ভূতলোক প্রেতলোক শাঁকচুন্নী লোক—নানান লোক। সেই ভূতলোক ছড়ানো ছিল মানুষের সংসারে, সমাজের বসতির চারি দিকে। পিণ্ডি দিলে ক্রিয়াকর্ম করলে তা থেকে মুক্তি পেত। পাপ খণ্ডন হয়ে চলে যেত স্বর্গে। এখন এসব কি বলছে এরা? কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

গয়েশ্বরী দেবীর বাবা ভূত। গয়েশ্বরীও ভূত বা প্রেতিনী। বুঝতে পারি। বাবাও ভূত হয়েছিল মেয়েও ভূত হয়েছিল। কিন্তু গয়েশ্বরীর বাবা মরল এ কি কথা।

ভূত মুক্তি পায়, তা বুঝি। কিন্তু ভূত মরবে কেন? যদি মরলই তবে মর্ত্যলোকে জন্মাতে চলল কেন? এবং মরল যদি তবে মরল কিসে? ভূত কি বুড়ো হয়? না ভূতের রোগ-টোগও হয়?

ভূতও মরে বাবা। ভূতও মরে। ভূতের বয়স হয় তবে বুড়ো হয় না। তবে তারা ইচ্ছে করলে ছোকরাও সাজতে পারে আবার বুড়োও সাজতে পারে। স্বপ্ন দেখে মানুষ, শোন নি? আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই গয়েশ্বরী নিজে থেকেই বললেন, বুড়ীর বুড়ো মরলে পর স্বপ্ন দেখে বুড়ো সেই অল্পবয়সী ছোকরা সেজে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

তবে ইদানীং বাবা ভূতদের ডিস্‌পেপসিয়া হচ্ছে। সেও ওই তোমাদের জন্যে। পিণ্ডি দিচ্ছ, তার মধ্যে ভেজাল চালাচ্ছ দেদার। আর রেশনের আতপ। মধু দিচ্ছে না, তার বদলে গুড় দিচ্ছে। তাতেও ভেজাল। ভূতদেরও দোষ আছে বাবা। আজ বছর কতক থেকে এই তোমাদের দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে এরা বড্ড বেশি মাছ খাচ্ছে বাবা। দেখছ না তোমাদের নদীতে মাছের অভাব। গোয়ালন্দে মাছগুলো পচছে আর সেই মাছ এরা আনছে। ওই যে শাঁকচুন্নীগুলোকে দেখলে, ওরাই ধরে আনছে। আনছে আর চড়া দরে বেচছে। তবে ভূতেরা রোগে ভোগে, রোগে মরে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে ভূত মরে বললেন যে?

হ্যাঁ বাবা মরে। ভূত বুড়ো হয়েও মরে না রোগেও মরে না। ভূতেরা মরে অপঘাতে বাবা অপঘাতে। আর সে অপঘাত ঘটায় মানুষে।

মানুষে? ভূতেই তো মানুষকে মারে শুনেছি। ঘাড়ে চাপে। ঘাড় মটকায়।

সে সব আগের কালের কথা বাবা। এখনকার কথা নয়। এখন তোমরা বাবা খুব চেঁচাতে শিখেছ। তিল হলে চেঁচিয়ে তাকে তাল করে তোল। তাই মানুষের কথাই শোনা যায়, ভূতের কথা শোন না, শুনতেও পাও না। ভূতেরা অনেক ভাল লোক বাবা। আর বেশ একটু বোকা। বুঝেছ। মানুষ যখন মরে তখন বুদ্ধিটুকু আনতে পারে না। তাই ভূতেরা বোকা হয়। ভূত কি রকম অপঘাতে মরে জান? মানুষেরা গাছ কাটে। কাটা গাছ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ভূতটি কিংবা ভূতগুলি চাপা পড়ে মরে। ঘরের সাঙায় বা ঘরের কোণে ভূত থাকে, ঘরটি ভাঙলেই ভূতটি ঘর চাপা পড়ে মরে। শুধু ঘর ভাঙা কেন বাবা, ঘরের কোণের অন্ধকারে থাকে ভূত, বেশ থাকে, একলা ঘর হলে নাচে হাসে দোল খায়। আবার একলা দোকলা মানুষকে পেলে বলে, মানে বল্‌তো বাবা, আগে, এখন আর বলে না, বলত তোঁর ঘাঁড় ভাঙব। কিংবা অন্য কিছু বলে ভয় দেখাত। তা সেই ঘরে দেওয়াল কেটে জানালা বসালেই আলো এল, বাতাস এল আর সঙ্গে সঙ্গে ভূতকে পালাতে হল। বাবা, কুনো ভূতনী নাম তার কুনী, অন্ধকার ঘরের কোণে থাকে, বুনো-ভূত বুনী-ভূতনী বনে থাকে। ঘর ভাঙলে কি জানালা বসিয়ে আলো ঢোকালেই কুনী ভূত পেত্‌নীকে পালাতে হয়। অনেক সময় বাবা ওই জানলা কাটার সময় গাঁইতি শাবলের খোঁচা খেয়ে কুনীরা মরে। ঠিক তেমনি বাবা বন কাটলে বুনো ভূতনী বুনো পেত্‌নী কাটারি দায়ের কোপ খেয়ে কাটা পড়ে, নয় তো, ডাল চাপা পড়ে মরে, নয় তো বন ছেড়ে পালায়। তা ছাড়া ভূতেরা সূর্য্যির আলো কি আগুনের আলো সইতে পারে না। তাপ লাগলে আলো লাগলে ভূতের ছায়া-শরীর গলে যায়। আমাদের বড় মজার শরীর বাবা। কাঁটার উপর বসতে পারি কিন্তু আলো সইতে পারি না। সেইজন্যে দিনের বেলায় আমরা ঘুমুই। রাত্রে আমাদের মাতন। সেইজন্যে আমাদের এই জোনাকি পোকা জমিয়ে মশালের ব্যবস্থা। ওরাই আমাদের মশালচী। আগুনও আমরা জানি না।

আমি অবাক হয়ে গয়েশ্বরীর কথা শুনলাম।

গয়েশ্বরী হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় সুখের বিধিব্যবস্থা ছিল বাবা। মানুষ মরত, মরে প্রেত হয়ে এই ভূতেশ্বর ভোলানাথের খাসমহলে আসত, দিনকতক থাকত; তারপর পিণ্ডিটিণ্ডি খেয়ে বৈতরণী পার হয়ে চলে যেত। স্বর্গে নরকে। যেখানে হোক। নরকে গেলে, নরক ভোগ শেষ করে স্বর্গে যেত। এখন সব উলটে গেল। তোমরা বললে, আমরা একজাত হই। ভূত আলাদা, মানুষ আলাদা। দেশ ভাগ করাল। শুধু তাই নয় ভূত-দের তোমরা মর্ত্যভুবনপুর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। মেরে ফেলছ। মানুষে মানুষ খুন করলে তোমরা ফাঁসি দাও কিন্তু ভূত মারলে বাহবা দাও। গ্রাহ্যই কর না। এ গাছে ভূত আছে, কাট এই গাছটা। এ বাড়িতে ভূত আছে, ভেঙে দাও ওটা, ভেঙে নতুন বাড়ি কর। এখানে কবরখানা, হোক গে। ওরই ওপর বানাও বাড়ি। তা ছাড়া তোমরা আকাশে প্লেন ওড়াচ্ছ। ভূতেদের আকাশপথে আনাগোনা, তারা অন্ধকার আকাশে দল বেঁধে বেড়াতে বের হয়। দেশ-দেশান্তরে যায় আকাশপথে। সেই আকাশে তোমাদের প্লেন উড়ছে। প্লেনের ধাক্কায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভূত মরছে। বাবা ছিষ্টির আদিকাল থেকে কত মানুষ মরেছে ভাব। যত মরেছে তার লাখে একজন দেবতা হয়েছে বাকীরা সব ভূত হয়েছে। তাহলে পৃথিবীময় ছড়িয়ে কত ছিল হিসেব করে দেখ। মানুষ ভূত, জন্তু ভূত, পাখি ভূত, পোকামাকড় ভূত, ভূতের কি সংখ্যা ছিল বাবা। পিলপিল করত গিজগিজ করত। ওই যে দেখছ বাবা, একটা চাপ বেঁধে রয়েছে পিঁপড়ে পোকার মত দেখছ না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওই তো বিজবিজ করছে, নড়ছে, চাপ বেঁধে রয়েছে।

হ্যাঁ। ওই সব হল জন্তু ভূত। ওর মধ্যে বাঘ মরে বাঘভূত হয়েছে, সিংহভূত হয়েছে, করিমভূত হয়েছে, ওরা সব হিংস্র জন্তু ভূত। ওদের সব খোঁয়াড়ে আটক করা আছে। আঃ! কি ভাল ব্যবস্থা যে ছিল, কি বলব বাবা!

আমি হেঁট হয়ে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে দেখলাম, তাই বটে, বাঘ ভালুক সিংহ কুম্ভীর গণ্ডারগুলো সব ছোট্ট পিঁপড়ের মত চেহারা নিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে গাঁক-গাঁক গর্জন করছে। দেখলাম দুটো পিঁপড়ের আকারের বাঘে লড়াই শুরু করেছে। গোটা চারেক ভালুক, তারাও ডেয়ো পিঁপড়ের মত। তারা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো উপরের দিকে তুলে চেঁচাচ্ছে।

গয়েশ্বরী বললেন, ওই শোন ভালুকরা বলছে, হে ভগবান আর আমরা হিংসা করব না। আমরা পোষ মেনে নেচে নেচে মানুষকে খুশি করব, আমাদের মুক্তি দাও।

একটা সিংহ চেঁচাচ্ছে। তারও আকার একটা লাল কাঠপিঁপড়ের মত। গয়েশ্বরী বললেন, ও বলছে আমি মকদ্দমা করব। আমি মা দুর্গার বাহনের জ্ঞাতি। আমাকে স্বর্গে পাঠানো হোক। অন্ততঃ স্পেশ্যাল ডায়েট দেওয়া হোক।

দুটো গণ্ডারে খাঁড়ায় খাঁড়া আটকে ঠেলাঠেলি করছিল। তারা এই বড় জোর দুটো বাচ্চা শুয়রে পোকার মত আকারের। বুনো শুণ্ডা হাতিগুলোকে মনে হচ্ছিল বড়—মানে জোয়ান শুয়রে পোকার মত।

গয়েশ্বরী আর একটু দূরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালেন, ওই দেখ। সেখানে দেখলাম গোরু মহিষ উট ঘোড়া হাতি রয়েছে। তাদের আকারও ছোট ছোট। গয়েশ্বরী বললেন, ওই হল গো দানালোক, ওইটে হল অশ্ব প্রেতলোক, ওইটে হল উট ভূতলোক আর ওইটে হল গজ ভূতলোক—মানে হাতিছানা লোক। আর ও-ই-টে কুকুর প্রেতলোক।

একটু হেসে বললেন, বাবা তুমি যে কটা কুকুর পুষেছিলে তারা মরে ওখানেই রয়েছে। বেটী বলে তোমার সেই অ্যালসেসিয়ানটা সেটাও ওখানে আছে।

বললাম, একবার দেখাবেন তাকে।

গয়েশ্বরী বললেন, তুমি তো এখনও মরনি বাবা। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ লাইনের ধারে গাছতলায়। সেই ফাঁকে তোমায় এনে সব দেখাচ্ছি, বোঝাচ্ছি।

ঠিক এই সময় কোথায় ঘন্টা পড়ল যেন কোন রাজবাড়ির দেউড়ীর ঘন্টা বাজল, ঢং-ঢং-ঢং। মানে তিনটে। এবং সঙ্গে সঙ্গে খোনা খোনা আওয়াজে শেয়ালভূতেরা ডাকতে লাগল হুঁকি হুঁয়া হুঁকি হুঁয়া—হুঁয়া হুঁয়া হুঁয়া—। পেঁচারা ডেকে গেল। সেও খোনা আওয়াজ। কে যেন নকীবের মত হাঁকলে, সাবধান রাত পোয়াচ্ছে। ভূতেরা সব সাবধান। যে যার বাড়ি ফের। বাড়ি ফের। সেও খোনা আওয়াজ। আকাশে চাঁদ ছিল না কিন্তু আওয়াজের কোরাসের মধ্যে মনে হল বিন্দু বিন্দু চন্দ্র—অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুর সরষে-বাটা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন, খোঁনা গলায় পুরবী রাগিণীতে গাইতে লাগল, "রাত্তি গেল, গেল রাত্তি ওগো তোমার পথ চেয়ে—"

বুঝলাম ভূতের রাজ্যে রাতের পালাই মানুষের দিনের পালার মত, তাই বেলা গেল, গেল বেলার বদলে—রাত্তি গেল, গেল রাত্তি করে নিয়েছে। ভূতটা গায় ভাল। গলা ভাল। কেবল খোঁনাটে একটু বেশি এই যা।

শুনে মন আমার উদাস হয়ে গেল। কিন্তু গয়েশ্বরী ঠাকরুন খোনা আওয়াজে হায়-হায় করে উঠলেন।—হাঁয়-হাঁয়-হাঁয়। এখন আমি কি করি?

আমি বললাম, কেন?

গয়েশ্বরী বলে উঠলেন,—ওঁরে, বাঁবারে। তিন পঁহর পাঁর হঁয়ে গেঁল। এঁখনও কঁথা বলা হঁল না। কি কঁরব রেঁ।

সেই দামিনী ঝি-ভূত এবার বলে উঠল, পান দোক্তা খাঁবে আর যঁত বাঁজে গঁল্প কঁরবে। সোঁজাসুঁজি বঁল না বাঁপু যে, সাঁরা ভূতভুবনপুর খেঁপে রয়েছে, তারা বলতে চায়, আমাদের দাবি মানতে হবে। তা না যত সব হঁয়ে। বাঁবা বাঁবা বাঁবা। এঁত বাঁবা বাঁবা কিঁসের গোঁ? ·অঁঃ—

থাঁম বঁলছি হারামজাদী। এ্যাঃ। এ যেন মর্ত্যভুবনপুর পেঁয়েছিস। হুঁ। কাঁউকে মানব না কিছু মানব না।

দামিনী মুখটা ফিরিয়ে জিভ কেটে ভেংচি কেটে দিলে গয়েশ্বরীর উদ্দেশে। সেটা আমি দেখতে পেলাম কিন্তু গয়েশ্বরী তা দেখতে পেলেন না। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন,

শোঁন বাঁবা। হ্যাঁ যা বলছিলাম। দামিনী মিঁছে বলে নি। আঁমাদের ভূঁতেরা বাঁবা মানুষদের উপর মর্ত্যভুঁবনপুরের উঁপর চঁটে গেঁছে। মঁস্ত মঁস্ত মিটিং হঁচ্ছে। তা অন্যায় তো বলতে পাঁরি না। তোমরা আমাদের ভূতদের মেরে মেরে প্রায় নিব্বংশ করতে চলেছ। প্লেনের ধাক্কায় ভূতেরা মরছে আকাশপথে চলবার সময়। ভূতদের বাবা চেহারা আছে দেহ নাই। ভূতেরা ইচ্ছেমত বড় হয়, ইচ্ছেমত ছোট হয়। তোমরা আমাদের সঙ্গে ভেয় হলে। ছোট দেশে এত ভূত। ওদিকে তোমরা সাহসী হলে, ভয় ভুললে। কি করি, ভূতরা আকারে ছোট হতে লাগল। মানুষে ভয় পেলে ভূতেরা বড় হয়। তাল গাছের মত বাঁশ গাছের মত। আবার সাহস করে লাঠি ঝাঁটা নিয়ে এলে এই এতটুকু, ওই জন্তু-জানোয়ার যেমন পিঁপড়ের মত হয়েছে তেমনি হয়ে যায়। তা নইলে উপায় কি বল? মানুষ মরে ভূত হয়। আজ পর্যন্ত পিথিমীতে সেই আদ্যিকাল থেকে যত মানুষ জন্মেছে তারা সবাই মরেছে। ভূতও হয়েছে। ভূত হলে এত ভূত কোথায় ধরবে বল। তাই দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে ভূতরা। তবে ইচ্ছে করলে, আর মানুষের যখন বুক ঢিপ ঢিপ করে তখন তারা বড় হয়ে যায়। এরা সেই ছোট চেহারা নিয়ে চামচিকের মত বাদুড়ের মত আকাশে যখন ওড়ে, তখন প্লেনের ধোঁয়ায় ওরা উড়ে যায়। পাখায় কেটে যায়। তার উপর অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন-বোমা ফাটাচ্ছ তোমরা। তাতে মানুষের নিরাপত্তা দেখ। ভূতদের দেখ না। ভূতরা তায় আঁচে পুড়ে ঝাঁজরা হয়ে গেল। ছাই হয়ে গেল। এঁই-সব কাঁরণে বাঁবা ভূতেরা খেপেছে। তারা রব তুলেছে। তাই তোমাকে শোনাতে এনেছি এখানে। তারা রব তুলেছে —শোঁধ চাঁই। শোঁধ চাঁই। মাঁনুষের অঁত্যাচারের শোঁধ চাঁই। অঁপমানের শোঁধ চাঁই। ওই ভূত-পুরীতে চীৎকার উঠছে—শুনতে পাচ্ছ?

সত্যিই একটা চীৎকার উঠেছিল। কোটি কোটি চন্দ্রবিন্দু যেন কোরাসে চেঁচাচ্ছে। কান পাতলাম। শব্দ উঠছে—চাঁই-চাঁই-চাঁই।

দামিনী বললে, এঁকটি ভূঁতের প্রাণের জন্যে দঁশটি মাঁনুষের জান চাঁই। হুঁ—হুঁ। চাঁই-চাঁই-চাঁই। একটি ভূতের প্রাণের জন্যে দশটি মানুষের জান চাই। অপমানের শোধ চাই।

আমি বললাম, অপমানটা কিসের? ভূতেরা মরছে মানুষের হাতে তা বুঝলাম। কিন্তু মান অপমান এল কোত্থেকে?

কোত্থেকে? হঠাৎ দামিনী রেগে উঠে বললে, কোত্থেকে? ওরে ও বাম্না। মানুষরা ভূত মানছে না কেন? ভূতকে ভয় করছে না কেন? এঁ্যা? দেখ্ না এবার কি করি? ভূতের জয়ধ্বনি দিইয়ে তবে ছাড়ব।

আমার বেশ মজা লাগছিল। আমি বললাম, তা ভূতেরা পারবে না। কখনও না।

পাঁরবে। পাঁরবে। নিশ্চয় পাঁরবে। একটি ভূঁত মরলে দশটি মানুষ মঁরবে। বলে দামিনী দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। সে এমন দাঁত কিড়মিড় যে আমি আচমকা যেন খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম।

গয়েশ্বরী বললেন, চমকাচ্ছ তুমি? এঁ্যা চমকাচ্ছ? তা হলে শোন। শৃঙ্খ শৃঙ্খ।

ভূঁতেরা রেঁগেছে। তাঁরা উঠে পড়ে লেঁগেছে এবার। মাঁনুষের সব চেষ্টা ভূঁতেরা ব্যর্থ কঁরে দেঁবে। ভূঁতেরা এঁবার কোঁমর বেঁধেছে।

বলতে বলতে গয়েশ্বরী খানিকটা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

নিজের আঁচলখানা টেনে কোমরে জড়িয়ে গাছকোমর বেঁধে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। হাতের নখ দিয়ে দামিনীর পিঠে খামচি কেটে দিলেন। দাঁতে দাঁতে ঘষে কড়মড় শব্দ করলেন।

এবার আমার সত্যিসত্যিই ভয় হল। নার্ভাস হয়ে গেলাম। যদি দামিনী তার ওই বাঁকা খাদন্ত দিয়ে কামড়ে দেয়। কি গয়েশ্বরী যদি হঠাৎ ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে, ওই মোটা কোলা হাতখানা বাড়িয়ে আমাকে টেনে—

চমকে উঠলাম। ভিতরটা গুরগুর করে উঠল। মনে পড়ল কে একজন ভূতের ভয়ে গাছে উঠে আরও ভয় পেয়েছিল। কারণ গাছের ভূতটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল, কি মজা এঁকেবারে হাঁতের কাঁছে পেলাম।

"ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে—ভূত বলে আমি পেলাম কাছে।"

আমারও তাই হল নাকি?

সত্যিই তাই হল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে গয়েশ্বরী দেবী বিকট খিলখিল শব্দে হাসতে লাগলেন।

হিঁ-হিঁ-হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ·····।

আমার খাঁচাছাড়া আত্মাপুরুষের সেই অদৃশ্য দেহের অত্যন্ত মিহি রোমগুলি খুব চমৎকার ভয়ে একেবারে পেরেকের মত খাড়া হয়ে উঠল। তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, একি একি, আপনি এমন করে হাসছেন কেন?

গয়েশ্বরী দেবী শুনে থামবেন কোথায়, তিনি আরও জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, বেশ বিনয় করেই বললাম, হাসবেন না। আমার ভয় করছে।

কঁরছে। কঁরছে। তাঁই তোঁ কঁরবে। তাঁ হলে এঁইবার দেঁখ। ওঁরে ভূতের বিক্রমটা দেঁখ্। দেঁখ এঁবার কঁত বঁড় কঁত চঁমৎকার ভঁয়ানক ইঁই দেঁখ্। নাঁস্তিক পাঁষণ্ড মাঁনুষ কোঁথাকার।

গয়েশ্বরী দেবী সঙ্গে সঙ্গে ফুলতে লাগলেন। বাড়তে লাগলেন। লম্বা হতে আরম্ভ করলেন।

ফুটবলের ব্লাডারকে যেমন ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায়, বেলুনকে যেমন ফোলানো যায় তেমনি ভাবে ফুলতে লাগলেন। মাথাটা বাড়তে লাগল। হাত-পাগুলি লম্বা পাকা বাঁশের মত লম্বা হতে লাগল।

শুধু তাঁরই নয়, তাঁর সঙ্গে দামিনীরও।

তার দাঁত দুটো মুলোর মত লম্বা হয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সেই দাঁত দুটি মেলে সে তার সেই বাঁশের মত লম্বা পায়ে নটরাজের নৃত্যভঙ্গিতে এক পা তুলে, এবং হাত দুখানা

দুপাশে বেশ মুদ্রাভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, গান ধর।

সভয়ে বললাম, কোন গান?

সে বললে, প্রলয় নাচন।

বললাম, জানি না।

সে বললে, তবে ছি ছি এত্তা জঞ্জাল ধর।

বললাম, তাও জানি না। আমি গানই জানি না।

এর পর কি হত তা জানি না। রক্ষা করলেন গয়েশ্বরী ঠাকরুন। হাজার হলেও তিনি অরিজিনাল ভূত—মানে শিবের ভূতের বংশের কন্যে। জমিদারনী না হোন পত্তনীদারনী। তিনি কি অতিথির ক্ষতি করেন। তিনি ক'যে এক ধমক দিলেন দামিনীকে। চুপ রহে হারামজাদী। হট যাও। মরণ, লজ্জার ঘাটে আর মুখ ধুসনি। নাচবি। সরে যা বলছি। নাচবি কি? মর্তে আমাদের বদনাম হবে। নাচবি কি?

যত বলছিলেন গয়েশ্বরী তত বাড়ছিলেন। ফুলছিলেন। তিনি ধাক্কা দিয়ে দামিনীকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, শোন বাপু আমি যা বলি তাই শোন। শুনে গিঁয়ে মানুষদের বলবে। শোন, মানুষ যেমন মানুষকে ভালোবেসে এক সঙ্গে মিলে বাস করে, ভালো না বাসলে যেমন মানুষে মানুষে ঝগড়া হয়, তেমনি ভূতে মানুষে এক সঙ্গে বাস করে পরস্পরকে ভয় করে। মানুষ ভূতকে রাতে ভয় করে। ভূত মানুষকে দিনে ভয় করে। সম্পর্ক ভয়ের। ভঁয় কঁরে বলেই মানুষ চায় ভূত থাকুক। অন্ধকারে থাকুক লুকিয়ে থাকুক। ছেলেরা যখন দুধ খাবে না তখন ডাকলে সাড়া দেবার জন্য থাকুক। একলা ঘরে শুয়ে মনে মনে কথা বলবার জন্যে ঘরে থাকুক। ভূত দিনে মানুষকে ভয় করে রাত্রে তাদের ভালবাসে। ভূতেরা আজও মানুষকে ভয় করে, ভালবাসে। কিন্তু মানুষেরা ভূতকে ভালও বাসে না ভয়ও করে না। লাখে লাখে তাদের খুন করছে। মারছে। তারই শোধ নেবার জন্যে ভূতেরা কোমর বেঁধেছে। প্রতিজ্ঞা করে তারা প্রতিদিন হাজারে হাজারে লাখে লাখে মরছে। ইচ্ছে করে মরছে। জাপানী-দের মত হারিকিরি করছে। কেন? জানিস?

সভয়ে বললাম, কেন?

উত্তরে হাসতে লাগলেন গয়েশ্বরী—হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ—

সেই খিলখিল খোনা ভূতুড়ে হাসি।

আমি বললাম, বলতে গিয়ে তোতলা হয়ে গেলাম। তোতলামি করে কোন রকমে বললাম, ন-ন-না। না—ঐ এ—এমন করে হাসছেন কৃ—কৃ কেন?

কেন হাঁসছি? হাঁসছি কেন?

হ্যাঁ।

কেন, তা বুঝতে পারছিস না। আজও বুঝতে পারিসনি?

না।

তবে শ্রবণ কঁর।

বলুন।

গায়েশ্বরী দেবী অকস্মাৎ আসন করে বসে আচমন করে বললেন, এবং সাধুভাষায় বললেন, নম ভূতেশ্বর, নম ভূতেশ্বর, নম ভূতেশ্বর। অতঃপর ওরে অর্বাচীন তবে শ্রবণ কর। মানুষ মরিয়া যেমন ভূত হয়, ভূত মরিয়াও তেমনি মানুষ হয়। ভাবিয়া দেখ, গত যুদ্ধে, যুদ্ধের সময় মহামারীতে কত লোক মরিয়াছিল। সকল দেশে মানুষের অভাব ঘটিয়াছিল। আর আজ এই কুড়ি বাইশ বৎসরের মধ্যে কি হইয়াছে দেখ। দেখ মানুষ বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? বাড়িয়াছে তো তাহারা আসিল কোথা হইতে? তোরা ভূতকে মারিয়াছিস, ভগবানকে মারিয়াছিস তাহার সঙ্গে দেবতাকেও মারিয়াছিস, একটি দেবতা ছাড়া। ব্রহ্মাকেও মারিয়াছিস বিষ্ণুকেও মারিয়াছিস, পারিসনি শুধু শিবকে। ব্রহ্মা যদি মরিল তবে এত লোক আসিল কোথা হইতে? কে তৈয়ারী করিল?

হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ।

আবার হাসি। একে সাধুভাষায় গম্ভীর গম্ভীর কথা এবং খোনা আওয়াজ তার সঙ্গে এই হাসি। ওঃ।

আবার আমি বললাম, আবার হাসছেন? দয়া করে যা বলছেন তাই বলে শেষ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে গায়েশ্বরী মাথায় হাত দুই লম্বা হলেন এবং প্রস্থেও খানিকটা ফুলে উঠলেন। এবং আরও জোরে হাসতে লাগলেন।

হিঁ—হিঁ—হিঁ। এঁখনই শেষ করতে হবে? ওরে মূর্খ! এঁখনও বুঁঝিলি না? ব্রহ্মাকে মারিয়াছিস, প্রাণী সৃষ্টি করিবার সৃষ্টিকর্তা নাই। তবুও সৃষ্টি হইতেছে কি করিয়া? ওরে ওই ভূতগুলো গিয়া মানুষ হইয়া জন্মিতেছে। ওই একালের চোঙা প্যাণ্ট কাকের বাসার মত চুল ওই কিম্ভূতকিমাকার জামাপরা ওই লিকলিকে চেহারা আজব আবির্ভাব দেখিয়া বুঝচিস না! সব ভূত হারিকিরি করিয়া মানুষদের উপর শোধ নিবার জন্য ফিরিয়া গিয়া মানুষ হইয়া জন্মিতেছে এবং বিশ্বব্যাপী ভূতের উপদ্রব শুরু করিয়াছে। মানুষেরা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে ভূত নাশ করিয়াছে, ভূতের ভয় ঘুচাইয়াছে, এ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারী করিয়াছে, এখন ভূতেরা মানুষ হইয়া জন্মিয়া ওইসকল বোমা লইয়া প্লেন লইয়া যুদ্ধ বাধাইয়া মানুষদের শেষ করিয়া ছাড়িবে। আমার বাবা সেই লড়াই বাধাইবার একজন মাতব্বর হইবার জন্য ভূত-দেহ ত্যাগ করিয়া মর্ত্যলোকে জন্মিতে চলিলেন। যুদ্ধ বাধিবে এবং তখন এ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার সব মানুষ মরিয়া যাইবে। মানুষ মরিলে ভূত হয়। সুতরাং সব বিলকুল বেবাক আপাদমস্তক আবালবৃদ্ধবনিতা.কাক কোকিল চিন শকুন পোকামাকড় জীবজন্তু গোরু ভেড়া বাঘ ভালুক মানুষ বনমানুষ সব মরিয়া গিয়া ভূত হইয়া এই অসুন্দর মানুষের পৃথিবীকে সুন্দর ভূতের পৃথিবীতে পরিণত করিবে।

মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। যেন নয়, সত্যিসত্যিই ঘুরতে লাগল।

সমস্ত ভূতভুবনপুরটাই যেন পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল। গয়েশ্বরী দেবীর সেই পাঁচশো লোকের পোলাও রান্না করার ডেকচিটার মত ফুলে বেড়ে ওঠা মাথাটা কখনও যেন লম্বা হয়ে

প্রকাণ্ড খোলের মত হয়ে যেতে লাগল আবার পরক্ষণেই গুটিয়ে কুঁকড়ে খাটিয়ে যেতে লাগল। তার সেই বিরাট বেলুনের মত দেহটাকে দিয়ে কোন বেলুনওয়ালা যেন মুচড়ে দুমড়ে নানান রকমের চেহারা দিতে লাগল। ওরা কারা যেন দল বেঁধে কোরাসে গান ধরেছিল—

মরবে না মরবে না ভূত কখনও মরবে না। আশ্চর্য ওদের সুর। সে খোনা আওয়াজে আকাশছোঁয়া চিৎকারে স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কাঁপিয়ে দিলে তারা। এবং তার বিচিত্র তালে যেন সকলেরই পা নাচতে চাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, মনে হল কেন, মনে পড়ছে, প্রাণপণে আত্ম-সংবরণ করে ঘুরে যাওয়া মাথাকে সোজা করে দেখলাম কেউ যেন ধেই ধেই করে বিস্ময়কর নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। এই মোটা এই লম্বা। এই মাথা এই পেট কিন্তু হাত এবং পাগুলি বাঁশের মত সরু আর বিস্ময়কররূপে লম্বা। সেই সরু শক্ত পায়ে সে ঝমোঝমো করে নাচ এবং সরু লম্বা হাতে আশ্চর্য আশ্চর্য মুদ্রা।

সে আর কেউ নয়। আমাদের মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী।

ভূত কখন হারবে না। মানুষেরা পারবে না।
ধারবে না ধার ধারবে না, কিছু কারুর।
বাঘ ভাল্লুক হাতি ঘোড়া
ছাগল ভেড়া মহিষ গোরুর।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ সেই ভূতভুবনপুরের ভোরবেলাকার ঘষা-কাচের মত আকাশে যেন ঝড় তুলে সোঁ সোঁ শব্দে একটা কোন যান এসে পাক খেতে খেতে নেমে পড়ল। দেখলাম সেটা একটা শিমুল গাছের ডাল। সেটার উপর ঘোড়ায় চাপার ভঙ্গিতে চেপে অতি সুন্দর ভৌতিক গড়নের এক পুরুষ। দেখতে পাঁজির সংক্রান্তি-মহাপুরুষের মত। কান সিঁটকে লম্বা, চোখ দুটি ব্যাঙের মত, মাথার চুল নেই। কাঠির মত বাঁ হাতে একটা খেলো হুঁকো ধরে মাঝে মাঝে টান দিতে দিতে ডালটা থেকে টপ্ করে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তারপর বকের মত পা ফেলে এগিয়ে এসে বললে, জয় হোক মা গয়েশ্বরীর। আমি এসেছি।

গয়েশ্বরী বললেন, যাক। ভালই। ভালই হয়েছে। এই দেখ সেই লাভপুরের সেই ছোকরা। কোমর বেঁধে লেগেছে ভূত নেই, ভূত থাকা উচিত নয় প্রমাণ করতে।

লোকটা আমার কাছে এসে নাক মুখ খিঁচিয়ে বললে, কার ছেলে র‍্যা তুই লাভপুরের?

আমি ক্রুদ্ধ হয়েই বললাম, কেন? আমি হরিদাসবাবুর ছেলে।

হরিদাসবাবু? সে কার ছেলে র‍্যা?

আমি বললাম, অভদ্র লোক কোথাকার—

সে বললে, ফাজিল ফকর লিটল বয়, কোন্ কুছকে কামকা নয়, জানে না কারে কি কইতে হয়। বল তোর ঠাকুরদার নাম। নইলে তাল গাছের মত লম্বা হয়ে যাব।

ভয় পেলাম। বললাম ঠাকুরদার নাম। দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ—দলুবাবুর নাতি তুই? এত পেকেছিস? "গন্ধে তিন ভুবন ময়-ময়!"

কিন্তু আপনি কে ?

লোকটি গান ধরে দিলে :

মন তুমি আসল খবর জানো না।
ভূত জন্ম সুখ জন্ম—বিনি আবাদে ফলে সোনা।

তালের মাথায় আমার তালুতে একটা চাঁটি মেরে বললে, বল তো আমি কে ?

আমার মনে পড়ে গেল, বললাম, রামাই।

রামাই বললে, ঠিক ধরেছিস।

আমি বললাম, কিন্তু আপনাকে খুঁজে পেলাম না কেন ?

রামাই বললে, গ্রাম লাভপুরের নিম গাছ কাটা পড়ল, শিমুল গাছ কাটা পড়ল, লোকেরা মেলেচ্ছ পড়া পড়লে, কি করব—রেফুজী হয়ে লাভপুরের ছিটমহল মানে লাভপুরের ভূতের গল্পের গাছের ডালে বাসা নিয়েছি। কিন্তু এ কি মতিচ্ছন্ন তোমার। ভূত নাই নাই করে নাচছ কেন ? ভূত আছে। থাকবে। ভূত মরবে না।

মারিলে মরিলে ভূত হবে মানুষের পুত—

তখন তাড়ালেও যাবে না তারা। তাদের প্রলয় নৃত্যে ত্রিভুবন কম্পিত হবে। বলে তিনি নিজেই নাচতে শুরু করে দিলেন।

আশ্চর্য নাচ, ভীষণ ভালো নাচ, ভয়ংকর চমৎকার নাচ।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। শুনলাম, রা—ম কালীবাবু। রামবাবু। রামবাবু।

আমার নাম। হ্যাঁ আমার নামই তো রামকালী। রাম-কালী।

বাস্। মুহূর্তে কি হয়ে গেল। সব যেন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। গয়েশ্বরী দেবীর সেই বিরাট পেট এবং মাথা যেন ফুটে যাওয়া বেলুনের মত মুহূর্তে গুটিয়ে এইটুকু একটুখানি রবারের মত হয়ে গেল। সেই বাঁশের মত লম্বা হাত-পাগুলি শুকুতে লাগল খাটো হতে লাগল ; ক্রমে বাঁশ থেকে শুকিয়ে কঞ্চির মত, তারপর কঞ্চি থেকে শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে গেল। লম্বাতেও গুটিয়ে খাটিয়ে খাটিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর যেন মুড়মুড় করে গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় মিশে গেল। ভূতভুবনপুরের সেই জোনাকি আলোয় আলোকিত সুন্দর অন্ধকার, তাও মিলিয়ে গিয়ে খানিকটা দিনের আলো আলো হয়ে এল।

রামকালীবাবু।

বুঝলাম, আমাকেই কেউ ডাকছেন। আগেই বলা উচিত ছিল আমার, বলতে ভুলে গেছি রামকালী শর্মা আমার নাম।

চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম, অনেক লোক জমে আছে। আমার মাথার কাছে বসে একজন ডাক্তার আমাকে দেখছেন। ইনজেকশন দিয়েছেন। সিরিঞ্জ ধুচ্ছেন। পাশে বসে একজন রেলের কর্মচারী আমাকে ডাকছেন, রামকালীবাবু।

চোখ মেলতেই তাঁরা সকলে বললেন, জ্ঞান হয়েছে জ্ঞান হয়েছে।

আমি উঠে বসতে গেলাম। কিন্তু তাঁরা উঠে বসতে দিলেন না। ধরাধরি করে ট্রেনের কামরায় তুলে বেঞ্চের উপর শুইয়ে দিলেন। আমার অনুচর রাম মহারানা সেও পাশে বসল। চোখ মুছতে মুছতে বললে, আমারও বড়ো ভয়ও লাগিয়িলি। সারা রাতও জ্ঞানও হইল না।

* * *

ট্রেন ডিরেল্‌ড হয়েছিল। আমার মাথায় ধাক্কা লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। এ একেবারে বাস্তব সত্য। কিন্তু—

কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় এসব কি হল ?

জানি না। কি হল বা হয়েছিল জানি না। বলতেও পারব না। অজ্ঞান অবস্থায় এমন স্বপ্ন কেউ কি দেখে ?

দেখে। নইলে আমি দেখলাম কেন ?

আমি দেখলাম যা তা আহত অসুস্থ মস্তিষ্কের স্বপ্ন হলেও সত্য। আজেবাজে স্বপ্নের মত মিথ্যেও নয়। মিথ্যে নয় এই কারণে বলছি যে এর পরও আমি গয়েশ্বরী দেবীকে স্বপ্নে দেখলাম। ঠিক দিন তিনেক পর, সেদিন ঘুমটি সবে এসেছে আর কে যেন বললে, ঘুঁমুলে নাঁকি ?

কে ?

আঁমি গঁয়েশ্বরী ঠাঁকরুন।

কি ?

দেখ সেদিন ওরা তোমার নাম ধরে ডাকলে, দশরথ রাজার বেটার নাম তার সঙ্গে আবার খেপা মায়ের নাম জোড়া। ও নাম হতেই আমরা ফুস্‌ধা হয়ে গেলাম। বেলুনে পিন ফুটিয়ে দিলে। কথাগুলো সব বলা হল না।

আর কি বলবে ? বলবার কি আছে ?

আছে বাছা আছে। রাগ করছ কেন ? রাগ করলে আমরা বাগ পাইনে। বুঝেছ ভয় না পেলে ভূতের সঙ্গে প্রেম হয় না। মানুষ ভূতকে ভয় করে ভূতও মানুষকে ভয় করে। সেইখানেই ভূতে মানুষে অজ্ঞাত প্রেম। সেই কারণেই মানুষ মরে ভূত হয় এবং ভূতেরা মরেও মানুষ হয়। শ্রবণ কর ভূতপুরাণের কথা। সেই আদ্যিকাল। জল নাই স্থল নাই শুধু বাতাস। মানুষ নাই ভূত নাই দেবতা নাই স্বর্গ নাই মর্ত্য নাই। সেই কাল। সেই আদ্যিকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনে বসে আছে কাজ নেই কর্ম নেই কি করে। কেউ পুজো করে না। কেউ লড়াই করে না। নিষ্কর্মার জীবন। দিনরাত্রিও নাই। কাল কাটে না। তখন তিনজনে বললে, এস ভাই খেলা করি।

কি খেলা ?

না, এস একজন আমরা গড়ি ; একজন সেইটেকে সাজাও ; একজন সেটাকে ভাঙ।

বেশ বলেছ।

ব্রহ্মা প্রথমে গড়লেন দিন। বিষ্ণু সূর্যকে পুব থেকে পশ্চিমে পৌঁছে দিলেন। শিব তাকে হাতে ধরে টেনে ডুবিয়ে দিলেন। ব্রহ্মা তাকে ধরে নিয়ে আবার উঠিয়ে দিলেন। আবার বিষ্ণু তাকে পশ্চিমে হাজির করলেন। শিব সূর্যকে ডুবিয়ে দিলেন। এরপর ব্রহ্মা একটা রাজ্য গড়লেন। কি রাজ্য না স্বর্গ। তারপর সে রাজ্যে থাকবে কে? তখন দেবতা গড়তে লাগলেন। বিষ্ণু তাদের পালন করতে লাগলেন। মানে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। এরপর সমুদ্র মন্থন করে সুধা তুলে দেবতারা অমর হলেন। শিব তখন বলে উঠলেন, দেবতারা অমর হল এখন আমি তাহলে ভাঙব কি, মারব কাকে? বলে রাগ করে তিনি ভূত তৈরী করলেন। শিব বলবান বটেন কিন্তু কারিগর ভালো নন। বুঝেছ। সেই কারণে ভূতেদের চেহারা ভাল নয়। তবে তারা যেমন ইচ্ছে তেমনি রূপ ধরতে পারে। এই তো ঝগড়া বাধে বাধে হল। তখন একটা সন্ধি হল। ব্রহ্মা তৈরি করলেন মর্ত্যভুবন। এবং সেখানে তৈরি করে দিলেন মানুষ। শিব ভূতগুলোকে পাঠালেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মা তাদের মানুষ করে মর্তধামে পাঠালেন।

আমি বললাম, তোমার মাথা। তুমি এক তাল বায়ু আমার মাথার মধ্যে এসে জমা হয়েছ। ভাগো বলছি, ভাগো। জানো আমার নাম—রা—ম কালী শর্মা—

বাস। ম্যাজিকের মত কাণ্ড। গয়েশ্বরী মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু একটা কথা কানে এল, আচ্ছা আমার বাবা তোমার বাড়িতে এসে জন্মাবেন। এবং প্রমাণ করে দেবেন যে যেসব ভূতকে তোমরা বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে বধ করছ তারা সবাই এসে তোমাদের মধ্যে জন্মাচ্ছে। মানুষ মরে ভূত হোক আর না হোক ভূত মরে মানুষ হচ্ছে। এবং প্রমাণ করছে—

মরবে না মরবে না—ভূত কখনও মরবে না।
মানুষেরা পারবে না—ভূত কখনও হারবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে সমস্ত ব্যাপারটা লিখে রাখাই স্থির করলাম। সত্য না হওয়াই উচিত।

তবে—

মিথ্যে না-ও হতে পারে।

সত্য মিথ্যা বিচারের যত কিছু ভার;
আমার নহেক তাহা, পাঠক তোমার।
ভূতপুরাণের কথা কহিলেন ভূতে
শুনিলেন পাঠকেরা মিলি পৌত্রপুতে।
ভূতপুরাণের কথা অমৃত সমান
রামকালী শর্মা কহে শুনে পুণ্যবান॥